# রায় নন্দিনী

ইসমাইল হোসেন শিরাজী

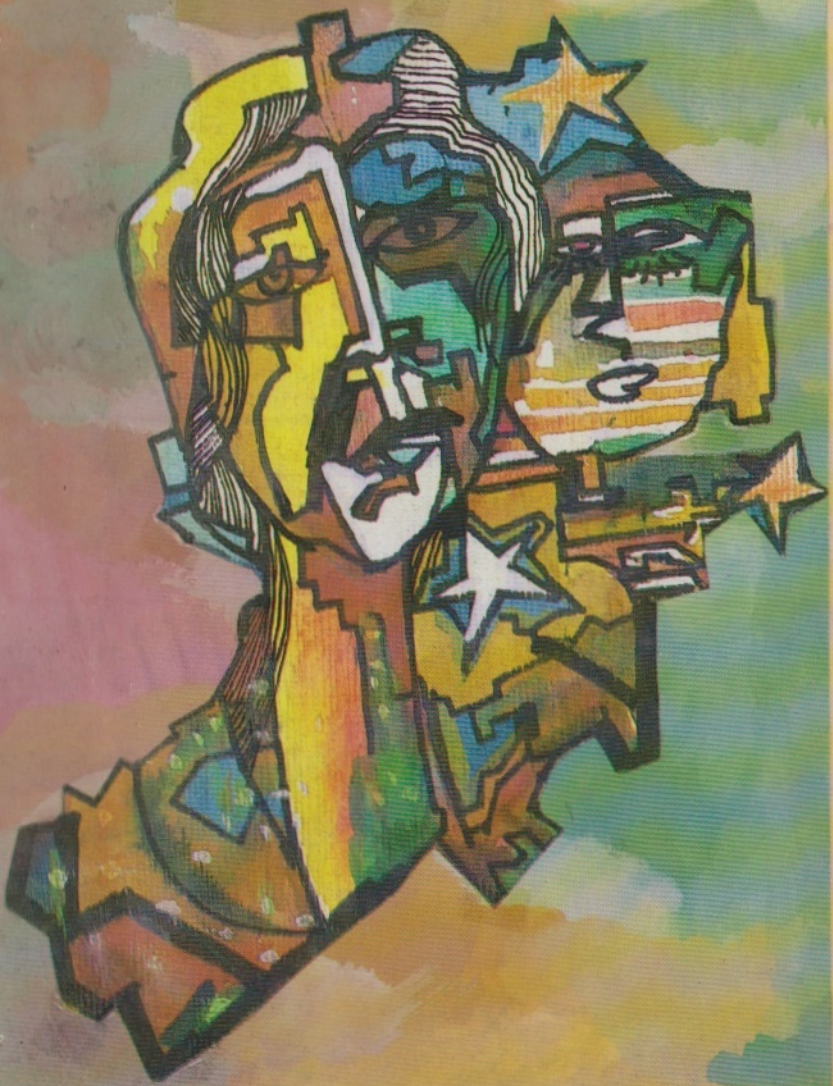

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# রায় নন্দিনী

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

# রায় নন্দিনী

ইসমাইল হোসেন শিরাজী

www.pathagar.com

রায় নন্দিনী
ইসমাইল হোসেন শিরাজী
**প্রকাশক**
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১ বড় মগবাজার ঢাকা -১২১৭
বাসাপত্র- ২৪
প্রথম প্রকাশ ১৩২১
**ষষ্ঠ প্রকাশ**
আশ্বিন ১৩৯৮
সেপ্টেম্বর ১৯৯১
**প্রচ্ছদ**
মোমিন উদ্দীন খালেদ
**মুদ্রক**
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
**কম্পোজ**
কনফিডেন্স কম্পিউটিং এন্ড প্রিন্টিং
ঢাকা
**মূল্য**
ষাট টাকা (সাদা)
পঁয়তাল্লিশ টাকা (নিউজ)

RAI NONDINI
By: Ismail Hossain Shiraji
**Published by**
Abdul Mannan Talib
Director,
Bangla Shahitta Parishad,
171 Bara Maghbazar, Dhaka 1217.
**Published on**
September 1991
**Price**
Tk. 60.00 (White)
Tk. 45.00 (News)

www.pathagar.com

# উপক্রমণিকা

বাঙ্গালী লেখকগণের যত্ন এবং চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ ভারতের সর্বপ্রধান ভাষায় পরিণত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ যতই সামান্য হউক, কিন্তু উপন্যাস এবং নাটক নভেলে বাংলা ভাষা আজ ভারাক্রান্ত। আর সেই সমস্ত গ্রন্থের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে মুসলমানের অলীক কলঙ্ক, কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। উপন্যাসগুলি মোসলেম বিদ্বেষের অনলকুন্ড। সে অনলকুন্ডে বিরাট-কীর্তি, বিপুল-যশা, সিংহতেজা মুসলমান জাতির গোলাম হইতে সম্রাট নবাব এবং বেগম ও শাহজাদীগণ পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীদিগের পূর্বপুরুষগণ অবলুণ্ঠিত মস্তকে যাঁহাদের পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, নিখিল জগৎ যে মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় এবং বীর্য-মহিমায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল-হায়! আজ সেই বিশ্বপূজ্য মুসলমান, বাঙ্গালী লেখকদিগের অপার কৃপায় অতি ঘৃণিত পিশাচ এবং অস্পৃশ্য কাম-কুক্কুররূপে চিত্রিত এবং বর্ণিত! হায়! যে নূরজাহান, রেজিয়া সোলতানা, জেবুন্নেছা, জাহানারা, মমতাজ মহল, দৌলতুন্নেসা প্রভৃতি বেগম ও শাহজাদীগণের পুণ্যপ্রতিভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের নামকরণেও পুণ্য সঞ্চার হয়, হায়! সেইসব বিদুষী পূতচরিত্রা সম্মানিতা মহিলাদিগকেও যারপরনাই হীন চরিত্রা এবং হিন্দু-প্রেমোন্মাদিনী রূপে অঙ্কিত করা হইযাছে। এ অত্যাচার, এ অবিচার একেবারেই অসহ্য। এ যন্ত্রণা একেবারেই মর্মন্তুদ!

ইহা ঐতিহাসিক ধ্রুবসত্য যে, মুসলমানদিগকে পৃথিবীর সকল জাতিই কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, কিন্তু মুসলমান কখনও অমুসলমান বা কাফেরকে কন্যাদান করেন নাই। যে সমস্ত আরব, তুর্কী, ইরাণী এবং পাঠান ও মোগল ভারতবর্ষে বিজয়ী বেশে তরবারি হস্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই সপত্নীক আসিয়াছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে হিন্দু ললনার পাণিপীড়ন করিতে হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ হইলেও মুসলমান বিজয়ের পরে ভারতের হিন্দু-মুসলমানে গভীর শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। "রাজপুতেরা মুসলমানের মাতুল কুল"-ইহা আজিও প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে। ফলতঃ তদানীন্তন হিন্দু রাজরাজড়ারা পর্যন্ত মুসলমানকে কন্যা দান করা অগৌরব বলিয়া আদৌ বোধ করেন নাই। বাদশাহদিগের জীবনী এবং ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু নরপতিরা বাদশাহ নবাব এবং বিজয়ী বীরদিগকে স্বেচ্ছায় উপঢৌকন স্বরূপও কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আর ইহা ভারতবর্ষের অতীব প্রাচীন প্রথা।

কিন্তু আধুনিক নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকেরা কল্পনায় ইহাকে জাতীয় কলঙ্ক মনে করিয়া নিদারুণ রোষাবেশে অতুল গৌরবান্বিতা পুণ্য-শ্লোকা মুসলমান মহিলাগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হিন্দু নায়কের প্রেমোন্মাদিনী রূপে চিত্রিত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কার্যতঃ যাহা কখনও ঘটে নাই, কল্পনায় তাঁহারা লেখনী পরিচালনা করিয়া সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে একেবারে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই এই

www.pathagar.com

অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুন্ডপাত এবং মর্মবিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বগুড়ার অধিবেশনে আমি অতি তীব্র এবং যুক্তিসঙ্গত তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলাম। দেশের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য, হিন্দু-মুসলমানের সখ্য ও সদ্ভাবের জন্য হিন্দু সুধীমন্ডলের নিকট মুসলমান চরিত্রকে কুৎসিত না করিবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার সে অনুরোধ বিফল হইয়াছে। বাঙ্গালার ছাপাখানা হইতে আজও শতধারে বর্ষার প্লাবনের ন্যায় রাশি রাশি হলাহলপূর্ণ নাটক-নভেল বাহির হইয়া ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অন্যদিকে আবার কলিকাতা এবং মফঃস্বলের শত শত স্থানে যাত্রা ও থিয়েটারের এই সমস্ত অলীক কলঙ্ক কুৎসা-পরিপূর্ণ ঘটনার অভিনয় হইয়া মুসলমান ছাত্র ও সাধারণ লোকের মনে হীনতা ও নীচতার বীজ বপন করিয়া মুসলমানের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার মূলে এমন নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতেছে যে, তাহাতে মুসলমানদের উন্নতি বা জাতীয় কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে।

বীর্যবান মহাপরাক্রান্ত শত্রুর সহস্র সহস্র তোপ-বন্দুকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত হইলে যে ক্ষতি না হইত, দুর্বল বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র লেখনী সঞ্চালনে তাহার অধিক ক্ষতি হইতেছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী লেখকের এই কাপুরুষোচিত হীন আক্রমণে শিক্ষিত মুসলমানদের অন্তঃকরণে যে সংক্ষোভ ও ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহার পরিণামও অতীব মারাত্মক। এ বিদ্বেষ যেরূপ দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতেছে, তাহার ফল উভয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরব-গানে বিভোর হইয়া কান্ডাকান্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনী পরিচালনায় দারুণ অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় "রায়-নন্দিনী" রচনা করিয়াছি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহাই অতীতের স্বাভাবিক চিত্র। মুসলমানের চরিত্রবল, মহত্ত্ব এবং স্বজাতি-প্রেমের উন্মাদনা সকল জাতি অপেক্ষা বেশী ছিল, ইহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা সহস্র বৎসর পর্যন্ত মুসলমান কখনও নিখিল ধরণীর একচ্ছত্র অধিপতি, ধর্মগুরু ও সভ্যতার শিক্ষকরূপে বিরাজ করিতে পারিতেন না। আজও বিশ্ববক্ষ হইতে তাহার প্রতাপ ও প্রভাবের জ্যোতিঃ নিবিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালীদিগের রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা নিদারুণ মর্মজ্বালা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উপন্যাস পাঠে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পক্ষান্তরে আশা করি, বাঙ্গালী লেখকগণ তাঁহাদের মুসলিম কুৎসাপূর্ণ জঘন্য উপন্যাসগুলির পরিবর্তন করিয়া সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীর্যপুষ্ট গৌরববিমন্ডিত আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন। নতুবা তাঁহাদের চৈতন্য উৎপাদনের জন্য আবার ঐসলামিক তেজঃদীপ্ত অপরাজেয় বজ্রমুখ লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইব।

বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
২০শে ফাল্গুন, ১৩২২ সন

সৈয়দ শিরাজী

www.pathagar.com

# রায় নন্দিনী

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

১. অরণ্যে অরুণোদয়-জামেদ আলী
২. লাল শাড়ী-জামেদ আলী
৩. মুনীরা-জামেদ আলী
৪. আল্লার পথের সৈনিক-নাজিব কিলানী
৫. রক্ত রঞ্জিত পথ-নাজিব কিলানী
৬. জেগে আছি-নূর মোহাম্মদ মল্লিক

www.pathagar.com

# রায় নন্দিনী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মন্দিরে

যখন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দুর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইসলামের অর্ধচন্দ্র- শোভিনী বিজয়-পতাকা গর্বভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, যখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রখর প্রভাব বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগ্ দিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল,যখন মুসলমানের লোক-চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়-ভেরী, জলদমন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল-যখন মুসলমানের শক্তি-মহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্যে ভারত-ভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল, যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ-কাকলীর সঙ্গে, মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয়-মহিমার আনন্দসংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল, যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল, যখন ব্রহ্মতেজঃ সন্দীপ্ত দরবেশদিগের সাধনায় ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের নির্মল কৌমুদীরাশি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী-ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল, যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব-উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল, যখন উত্তরে শ্যাম-কাননাম্বর গগন-বিচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি তাহার গম্ভীর মেঘ-নির্ঘোষে ও চপলা-বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তার ভারত-সমুদ্র অনন্ত কলকল্লোলে ও অনন্ত-তরঙ্গ বাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান-পরম্পরার বিশুভ্র-যশোগাথা কীর্তন করিতেছিল, যখন পৌরাণিক বংশমর্যাদাভিমানী চন্দ্র, সূর্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শক, রাজপুত, জাঠগোত্রীয় অসংখ্য জাতি মহিমান্বিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ-বিদলনকারী চরণতলে ভূনত-জানু ও বিনত-মস্তক হইতে কুণ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল, যখন নগরী কুলসম্রাজ্ঞী বিপুল

www.pathagar.com

বীর্য ও ঐশ্বর্যশালিনী দিল্লীর তখ্‌তে অধ্যবসায়ের অবতার প্রথিত-যশা আকবরশাহ উপবেশন করিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, যখন বীরপুরুষ দায়ুদ খাঁ, সুজলা-সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য-উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরব-স্পর্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন- সেই সময়ে একদিন বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা দশমীতে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শ্রীপুর ও খিজিরপুরের মধ্যবর্তী রাস্তার এক চটিতে কতকগুলি রক্ষীসহ একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাল্কীখানা বিবিধ কারুকার্যে অতি চমৎকাররূপে সজ্জিত। পাল্কীর উপরে ঝালরযুক্ত জরীর চাদর শোভা পাইতেছে। পাল্কীর সঙ্গে দুইজন মশাল্‌চী। তাহাদের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড মশাল কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকাররাশি অপসারিত এবং সেই বৃক্ষ-সমাকীর্ণ চটির বহুস্থান আলোকিত করিয়া শাঁ শাঁ করিয়া জ্বলিতেছিল। বারজন রক্ষী, আটজন বেহারা এবং তদ্ব্যতীত তিনজন ভারী ও একজন সম্ভ্রান্ত যুবক পাল্কীর সঙ্গে ছিল। রক্ষী বারজনের মধ্যে তিনজনের হস্তে বন্দুক, পাঁচজনের হস্তে রামদা এবং চারিজনের হস্তে তেল-চুক্‌চুকে রূপা দিয়া গাঁট-বাঁধা বাঁশের পাকা লাঠি। সকলেই পদাতিক; কেবল সম্ভ্রান্ত যুবকটি একটি বলিষ্ঠ অশ্বের আরোহী। যুবকের গায়ে পিরহান, পরিধানে ধুতি, মস্তকে একটি জরীর টুপী, কটীতে চাদরের দৃঢ় বেষ্টনী, পায়ে দিল্লীর সুন্দর নাগরা জুতা। যুবকের কটীতে একখানি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র তরবারি দুলিতেছিল। যুবকের বয়স অন্যূন বিংশতি বর্ষ। চেহারা বেশ কমনীয় ও পুষ্ট; গঠন দোহারা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ মাংসল সেরূপ পেশীযুক্ত নহে। যুবক যে সম্ভ্রান্ত বংশের, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বেহারারা চটির একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী ঘন পত্রযুক্ত বটবৃক্ষের মূলে পাল্কী নামাইয়া কাঁধের গামছা দিয়া দুই চারিবার হাওয়া খাইয়া গাছের নিকটেই ঘুরিতে লাগিল। যুবকটি ঘোড়া হইতে নামিয়া একটি রক্ষীর কোমরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র বিড়িদান হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিতে লাগিল। একজন রক্ষী একটি আমগাছের চারার সহিত ঘোড়াটিকে আটকাইয়া রাখিল। ভারীরা ভার নামাইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর তামাক সাজিয়া সকলেই তামাক খাইতে লাগিল। একটি রক্ষী ভার হইতে একটি ভাল কাল-মিশমিশে নারিকেলী হুঁকা বাহির করিয়া একটু ভাল তামাক যুবককে সাজিয়া দিল। যুবক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ছাড়িতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে বট গাছের তলা হুকার সুমধুর গুড়গুড় ধ্বনিতে ও কুণ্ডলীকৃত ধূমে সজাগ স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসের নির্মেঘ আকাশ, স্থির প্রশান্ত সাগরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। অসংখ্য সমুজ্জ্বল নক্ষত্র নীলাকাশে, নীল সরোবরে হীরক-পদ্মের ন্যায় দীপিয়া দীপিয়া



www.pathagar.com

জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকার, তাহার আলোকে অনেকটা তরল বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাস নিরুদ্ধ। উচ্চশির বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত কাঁপিতেছে না। বেজায় গরম! অত্যন্ত শীতল-রক্ত ব্যক্তির গা দিয়াও দরদর ধারায় ঘাম ছুটিয়াছে। চটির পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার অপর দিকস্থ সবুজ জঙ্গলে অসংখ্য জোনাকী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অথবা প্রেমিক-কবিচিত্তের মধুময়ী কল্পনা-বিলাসের ন্যায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া এক চিত্তবিনোদন নয়ন-মোহন শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। দূরে একটি উন্নত আমগাছের শাখায় বসিয়া একটি পাপিয়া তাহার সুমধুর স্বরলহরীতে নীরব-নিথর পবন-সাগরে একটি অমৃতের ধারা ছুটাইয়া দিতেছিল। সেই স্বরের অমৃত-প্রবাহ, কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে-দূরে অতি সুদূরে নীলাকাশের কোলে মিশাইয়া যাইতেছিল। কিছু পরে দূরবর্তী গ্রামের বংশকুঞ্জের মধ্যে আরও একটি পাপিয়া, আম্রশাখায় উপবিষ্ট পাপিয়াটির প্রত্যুত্তরচ্ছলে গাহিতে লাগিল। উহা স্বপ্নরাজ্যের সাগর পারস্থ বীণাধ্বনির ন্যায় মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার সেই ঝঙ্কারও কাঁপিয়া কাঁপিয়া শ্রুতি-মূলে প্রেম-স্মৃতি জাগাইতেছিল। সকলের তামাক সেবন শেষ হইলে যুবকটি বলিল, "শিবু, আর দেরী করা সঙ্গত নয়। পাল্কী উঠাও। সাদুল্লাপুর এখনও প্রায় দু'ক্রোশ। অনেক রাত্রি হচ্ছে, স্বর্ণের বোধ হয় ক্ষুধাও লেগেছে।" শিবনাথ বলিল, "কর্তা! আমরা এতক্ষণ সাদুল্লাপুরের ঘাটে যে'য়ে পহুঁছতাম; কেবল ঘাট-মাঝির দোষেই এত বিলম্ব হ'ল। বেটা অমনতর ভাঙ্গা নৌকায় খেয়া দেয় যে, আমার তো দেখেই ভয় করে। যাবার সময় ঐ নৌকায় কিছুতেই পার হব না।"

যুবকঃ যাবার সময় ভাল নৌকা না পে'লে বেটার হাড্ডী চূর করে দিব। আজ ভাঙ্গা নৌকার জন্য ক্রমে ক্রমে পার হ'তে প্রায় দুই ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে।

এমন সময় পাল্কীর দ্বার খুলিবার খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। যুবক মুখ ফিরাইয়া পাল্কীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি স্বর্ণ! বড় গরম বোধ হচ্ছে? বাইরে বেরুবি?"

পাল্কীর ভিতর হইতে মধুর ঝঙ্কারে উত্তর হইল, "হাঁ দাদা! বড় গরম! সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে গেছে। পাল্কীর ভিতরে ব'সে ব'সে হাত-পা একেবারে লেগে গেছে।"

যুবকঃ শিবু! পাল্কীর দরজা খুলে দাও। আর একখানি গালিচা ঐ ঘাসের উপর বিছিয়ে দাও। স্বর্ণ একটু বাইরে শরীর ঠান্ডা করুক। বড় গরম পড়েছে। স্বর্ণ একটু ঠান্ডা হলে তোমরা পাল্কী উঠাও।

শিবনাথ যুবকের আদেশ মত ভার হইতে একখানি গালিচা লইয়া গাছ হইতে একটু দূরে খোলা আকাশের নীচে, যেখানে খানিকটা জায়গা ঘাসে ঢাকা ছিল, সেইখানে বিছাইয়া দিল। তারপর পাল্কীর দরজা খুলিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাকরুণ! বাইরে আসুন। বিছানা পেতেছি।"



www.pathagar.com

সহসা পাল্কীর ভিতর হইতে বহুমূল্য পীতবর্ণ বাণারসী শাড়ী-পরিহিতা, রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্কৃতা এক উদ্ভিন্ন- যৌবনা অপূর্ব ষোড়শী সুন্দরী বহির্গত হইল। তাহার রূপের প্রভায় মশালের উজ্জ্বল আলোকও যেন কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া পড়িল। তাহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত রক্তকমল-সদৃশ পাদ-বিচুম্বী মঞ্জীর-শিঞ্জনে মেদিনী পুলকে শিহরিত হইল। তাহার বিশাল নেত্রের মাধুর্যময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দৃষ্টি-পথবর্তী দূরব্যাপী অন্ধকার তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার নিঃশ্বাসে বায়ুতে মনোহর মৃদু কম্পন উপস্থিত হইল।

যুবতী যখন পাল্কীর ভিতর হইতে নির্গত হইল, তখন মনে হইল, যেন পুষ্পকুন্তলা রক্তাম্বরা বিচিত্র বর্ণশোভী-অম্বুদাঞ্চলা বিশ্ববিনোদিনী হাস্যময়ী ঊষাদেবী পূর্বাকাশের দ্বার উদঘাটনপূর্বক ধরণীবক্ষে নবজীবনের পুলক-প্রবাহ সঞ্চারের নিমিত্ত, নীলিম প্রশান্ত সাগরের শ্যামতটে আবির্ভূত হইলেন। যুবতী এমনি সুন্দরী! এমনি বিনোদিনী!! এবং এমনি মাধুর্যময়ী!!! যুবতী ধীরে ধীরে যাইয়া গালিচার উপর উপবেশন করিল। যুবতীর রূপের ছটায় সে জায়গাটা যেন নিতান্তই বিশোভিত হইয়া উঠিল। যুবতীর অঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট আতরের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া চটিটাকে আমোদিত করিয়া তুলিল। যুবতী সেখানে বসিয়া তাম্বুল-করঙ্ক হইতে তাম্বুল লইয়া কয়েকটি যুবককে দিয়া নিজেও দুই একটি চর্বণ করিতে লাগিল। চটিতে লোকজন তখন কেহ ছিল না। একখানা বাংলা ঘরে একটি মুদি দোকান। তাহাতে একজন মুদি ও একটি ছোকরা মাত্র ছিল। গরমের জন্য ছোকরাকে ঘরে রাখিয়া মুদি বাহিরে আসিয়া গাছের নিকটে খড়ম পায়ে গামছা কাঁধে দাঁড়াইয়া বেহারা ও রক্ষীদিগের হাবভাব কৌতূহলভরে দেখিতেছিল। যেখানে চটি, তাহার নিকটেই প্রকৃতি দেবীর সুবিশাল শ্যামচ্ছত্ররূপ কয়েকটি প্রকান্ড বটবৃক্ষের নীচে একটি বড় হাট বসিয়া থাকে। হাটের দক্ষিণ পার্শ্বেই একখানি বৃহৎ ঘর। তার চারিদিকে মাটির দেয়াল। যে কেহ রাত্রিকালে এখানে আশ্রয় লইতে পারে। মুদির দোকানে চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ী, গুড়, হাঁড়ি, খড়ি সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা হইলে রান্না করিয়া খাইয়া থাকিতে পারা যায়।

নিকটে একটা বড় ইঁদারা আছে। মুদি কেবল গরমের জন্য বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নহে। অনেক লোক দেখিয়া সে আজ অনেক চাল, ডাল, হাঁড়ি, খড়ি বিক্রয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে যখন বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বিক্রমপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা কেদার রায়ের লোকজন তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া শ্রীপুর হইতে সাদুল্লাপুরে যাইতেছে, তখন তাহার উচ্ছ্বসিত মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। পাছে রাজার লোকেরা তাহার দোকান হইতে জিনিসপত্র না লুটিয়া লয়!

যুবক রাস্তার ধারে গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারি করিতেছিল।



www.pathagar.com

বেহারা, রক্ষী ও ভারীরা গাছের তলায় তামাক সেবন এবং নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতেছিল। পশ্চিমদিক হইতে সহসা একটু ঠান্ডা হাওয়া প্রবাহিত হইয়া যুবকের বাবরী চুল দোলাইয়া গেল। যুবক পশ্চিম দিকে তাকাইয়া দেখিল, একখন্ড কালো মেঘ গগন প্রান্তে মাথা তুলিয়া দৈত্যের মত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতেছে। মেঘের চেহারায় বুঝা যাইতেছিল যে, উহা ঝটিকা-গর্ভ।

যুবক মেঘ দেখিয়া একটু ব্যস্ত কণ্ঠে বলিল, "শিবু! পশ্চিমে মেঘ করেছে। সকালে পাল্কী তোল।" মেঘের কথা শুনিয়া সকলে গাছের নীচ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই মেঘ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। শিবু মেঘ দেখিয়া যুবকের উদ্দেশ্যে বলিল, "দাদা মশায়! মেঘত খুব বেড়ে চলেছে। পাল্কী এখন চটিতে রাখা যাক। মেঘটা দেখেই যাওয়া যাবে।"

যুবকঃ "মেঘ আসতে আসতে আমরা অনেক দূর যেতে পারব। যেরূপ হাওয়া দিচ্ছে, তাতে মেঘখানা উড়েও যেতে পারে।" বলিতে বলিতে হাওয়া একটু জোরেই বহিতে লাগিল এবং মেঘের উপরের অংশটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলে অনুমান করিল যে, মেঘ আর জমাট বাঁধিতে পারিবে না।

একটু হাওয়া ব্যতীত আর কোনও আশঙ্কা নাই। তখন বেহারারা "জয় কালী" বলিয়া পাল্কী কাঁধে তুলিল "হেঁই হেঁই" করিতে করিতে সাদুল্লাপুরের দিকে ছুটিল। শীতল বাতাসে তাহাদের বড় স্ফূর্তি বোধ হইতেছিল। দুইটি মশাল অগ্র ও পশ্চাতে বায়ু প্রবাহে শাঁ শাঁ করিয়া তীব্র শিখা বিস্তারপূর্বক অন্ধকার নাশ করিতেছিল। কিন্তু কয়েক রশি যাইবার পরেই কড়ু কড়ু গড়ু গড়ু করিয়া মেঘ একবার ডাকিয়া উঠিল এবং তারপর মুহূর্তেই সমুদ্রের প্রমত্ত প্লাবনের ন্যায় আকাশ-রূপ বেলাভূমি যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দ্যিমন্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত হইল। মাথার উপরে ক্রুদ্ধ মেঘের স্তর ক্রমাগতই গড়াইতে ও গর্জন করিতে লাগিল। পবন হুঙ্কার দিয়া চতুষ্পার্শ্বের গাছপালার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে চটাপট বৃষ্টির ফোঁটাও পড়িতে আরম্ভ করিল। যুবক অশ্বারোহণে অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, তোরা সকলে আয়! চক্রবর্তীদের শিব-মন্দির সম্মুখেই, রাস্তার ধারে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে।" বেহারা ও সর্দারেরা তাড়াতাড়ি ছুটিতে লাগিল।



www.pathagar.com

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
## লুণ্ঠন

শিব-মন্দির প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময় চতুর্দিকে 'রি-রি-রি-মার-মার' শব্দ উত্থিত হইল। সর্দার ও রক্ষিগণ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পর্তুগীজ ও বাঙ্গালী দস্যুগণ তাহাদের উপর লাঠি ও সড়কি বর্ষণ করিতে লাগিল। বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া, রক্ষীরা অস্ত্র ফেলিয়া, সেই ভীষণ অন্ধকারে দিগ্বিদিকে বৃক-তাড়িত শৃগালের ন্যায় ছুটিয়া পালাইল। অন্ধকারে আছাড় পড়িয়া, হোঁচট খাইয়া, গাছের বাড়ি খাইয়া যাহারা পলাইল, তাহাদেরও অনেকে সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। পাঁচজন প্রহরী, দস্যুদের বিষম প্রহারে প্রাণত্যাগ করিল।

একজন মশালধারী মালী আক্রান্ত হইয়া, জ্বলন্ত মশালের আগুনে আততায়ীকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে একজন পর্তুগীজ দস্যু তাহাকে তরবারির ভীষণ আঘাতে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে জখম হইল! দূরে অশ্বারোহী যুবকের কণ্ঠ হইতে এক একবার আর্তচীৎকার শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু এই ভীষণ দুর্যোগ ও পবনের মাতামাতির হুঙ্কারে সেই আর্তচীৎকার গ্রামবাসী কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৃষ্টিও যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে পড়িতে লাগিল। যেমন সূচিভেদ্য অন্ধকার, তেমনি মেঘের ঘন ভীষণ গর্জন এবং তুমুল বর্ষণ। মাঝে মাঝে চঞ্চলা দামিনীলতা ক্ষণকালের জন্য রূপের লহরী দেখাইয়া করাল ভ্রুভঙ্গীতে এই দুর্যোগের কেবল ভীষণতাই বৃদ্ধি করিতেছিল। দস্যুরাও সেই ভীষণ দুর্যোগে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা পাল্কীখানা তুলিয়া লইয়া নিকটবর্তী শিব-মন্দিরের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেও বৃষ্টির ঝাপ্টা তাহাদিগকে সিক্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রস্তরের আঘাতে রুদ্ধ দ্বারের তালা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। তারপর চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া মন্দিরের প্রদীপ জ্বালাইল। প্রদীপের আলোকে সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত হইল। মন্দিরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ভিতরের চুনকাম ধবধব করিতেছে। একটি কাল প্রস্তরের বেদীর উপরে এক হস্ত অপেক্ষা দীর্ঘ সিন্দুরচর্চিত বিল্বপত্র ও পুষ্প-পরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পার্শ্বে একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতগুলি সলিতা প্রভৃতি পূজার উপকরণ রহিয়াছে। দস্যুদের মধ্যে পনের জন শিবলিঙ্গ দেখিয়া "জয় শিব শঙ্কর বোম ভোলানাথ" বলিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিল। তারপর একজন বলিয়া উঠিল, "বাবা ভোলানাথ! আজ তোমার আশীর্বাদেই আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এ দারুণ দুর্যোগে তুমি আমাদিগকে



www.pathagar.com

আশ্রয় দিয়াছ।" অবশিষ্ট পাঁচজন পর্তুগীজ দস্যু, তাহারা প্রস্তরের এই বীভৎস লিঙ্গকে ভক্তি করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! তাহারা আরও বিবিধ প্রকারের সুন্দর ও ভীষণ মূর্তির সম্মুখে হিন্দুদিগকে গড় করিতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এমন উদ্দন্ডলিঙ্গও যে উপাস্য দেবতা হইতে পারে, ইহা কখনও তাহাদের ধারণা ছিল না। একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টোমাডের এ লিঙ্গপূজার মট্‌লব কি আছে?" তখন সেই বাঙ্গালী দস্যুদের মধ্য হইতে একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠকায় উজ্জ্বল চক্ষু যুবক বলিল, "গডফ্রে! তুমি ক্রেস্তান, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে? লিঙ্গই যে পরম বস্তু, লিঙ্গই ত স্রষ্টা, লিঙ্গ হইতেই ত আমরা জন্মিয়াছি। তাই লিঙ্গ পূজা করিতে হয়।"

গডফ্রেঃ হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ হইটে জন্ম, বেশ কটা আছে। কিন্টু আমি মনে করি, লিঙ্গ পুজা টোমাডের.....পক্ষে ভাল হয় টোমরা পুরুষ মানুষ আছ,..... টোমরা শিবের লিঙ্গটা পূজা করিটে যাইবে কেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ পূজা!!

এমন সময় পাল্কীর মধ্যে ফিঁক্‌রিয়া ফিঁক্‌রিয়া কাঁদিবার শব্দ শোনা গেল। সেই বলিষ্ঠকায় যুবকটি তখন পাল্কীর দরজা খুলিয়া প্রদীপটা লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! ক্রন্দন করবেন না। ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমরা আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। আমরা যশোহরের অধীশ্বর প্রবল-প্রতাপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের লোক। মহারাজ আপনাকে বিবাহ করার জন্য আপনার পিতা রাজা কেদার রায়ের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আপনার পিতা বহু সপত্নীর ভয়ে আপনাকে প্রতাপাদিত্যের করে সমর্পণ কোর্তে রাজী হননি; আপনি অবশ্য তাহা অবগত আছেন। তাই আপনাকে আমরা লুটে নেওয়ার জন্য এক বৎসর পর্যন্ত সুযোগ অনুসন্ধান করছিলাম। আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি আমাদের মহারাজের সর্বাপেক্ষা পেয়ারের রাণী হবেন। চল্লিশ রাণীর উপরে আপনি আধিপত্য কোর্বেন। আর এরূপ লুটে নেওয়ায় আপনার পিতার পক্ষে কোন কলঙ্কের কথা নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা দেবীকে মহাপুরুষ অর্জুন হরণ করেছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বরং অনুরাগীই হয়েছিলেন।" এমন সময় দরজায় যুগপৎ ভীষণ পদাঘাত ও বীর কণ্ঠে "কোন হায়! দরওয়াজা খোল" শ্রুত হইল। ভীষণ পদাঘাতে দ্বারের ভিতর দিকের হুড়কা ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। সহসা কম্পিত শিখা-প্রদীপের ক্ষীণালোক সেই আগন্তুকের মুখের উপর পড়ায় দস্যুরা কম্পিত হৃদয়ে দেখিল,-এক তেজঃপুঞ্জ-বীরমূর্তি, উলঙ্গ-কৃপাণ-পাণি উষ্ণীষ-শীর্ষ মুসলমান যুবক, রোষ-কষায়িত-লোচনে মন্দির-প্রবেশে উদ্যত। যুবকের প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু হইতে কালানলজ্বালা নির্গত হইতেছে। দস্যুরা মুহূর্ত মধ্যে লাঠি তরবারি লইয়া প্রহার-উদ্যত-বাহু হইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিল, "কে তুমি? তুমি এখানে



www.pathagar.com

কেন? পলায়ন কর, এ শিব-মন্দির, এখানে মুসলমানের আশ্রয় নাই।" দস্যুদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই যুবকের ভীষণ তরবারি-আঘাতে একজন দস্যুর বাহু ছিন্ন এবং অপরের স্কন্ধ ভীষণরূপে কাটিয়া গেল। তখন দস্যুগণ প্রমাদ গণিয়া সকলে ভীষণ তেজে এক সঙ্গে তাঁহার উপর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইবার উপক্রম করিল। যুবক কৌশলে দ্বারের বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে তরবারি তুলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আক্রমণোদ্যত-দস্যু-মস্তক দ্বারের ভিতরে আসিবামাত্রই তাঁহার শাণিত কৃপাণের বজ্র প্রহারে ছিন্ন হইতে লাগিল। লাঠি ও বল্লমের দণ্ডগুলি তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ছুটিয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচজন নিহত এবং সাতজন ভীষণরূপে জখম হইল। রক্তধারা আসিয়া বাহিরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। যুবকের বীর বিক্রম এবং অস্ত্র সঞ্চালনের অমোঘতা দর্শনে অবশিষ্ট পর্তুগীজ ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সকলে বীর যুবকের পদে নিরীহ মেষের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গড্‌ফ্রে তাহার বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত করিয়া কহিল, "কভি নেহি, আভি হাম ফটে করে গা।" সে এই বলিয়া যুবককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। যুবক চকিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। পিস্তলের গুলী মাথার উপর দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল। যুবক পর মুহূর্তে চকিতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রসারিত করে তরবারি আস্ফালন করিলেন। তরবারি নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকায় গডফ্রের মস্তকটি গ্রীবাচ্যুত হইয়া পক্ক তালের মত সশব্দে ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া মন্দিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। শিব-মন্দিরে মাত্র একটি দ্বার, সুতরাং দস্যুদিগের পলায়ন করিবার উপায় ছিল না। এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিবারও সুবিধা ছিল না। যুবক দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। দুইজনের বেশী একসঙ্গে দ্বারের ভিতরে পাশাপাশি দাঁড়ান যাইতে পারে না।

যে দ্বারের নিকটবর্তী হইতেছিল, তাহারই মস্তক যুবকের অসি-প্রহারে ভূ-চুম্বন করিতেছিল। দস্যুগণ প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হইয়া প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারে সন্ত্রস্ত অবস্থায় মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ায় সমস্তই ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার! নিজের শরীর পর্যন্তও দেখা যাইতেছে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যুবক অবিরল বারিধারায় সিক্ত হইতেছিলেন। বৃষ্টি তখনও ঘন ধারায় অবিরাম বর্ষিতেছিল। বাতাস হুঙ্কার দিয়া এক একবার বড় বড় গাছের মাথা দোলাইয়া পাতা উড়াইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। যুবক অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, "দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অন্ধকারের মধ্যে অলক্ষ্যে আসিয়া দস্যুগণ সহসা আক্রমণ করিতে পারে।" এজন্য দরজা টানিয়া বাহির হইতে বন্ধ করায় দস্যুরা আরও ভীত হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র অথবা বৃষ্টি ও দুর্যোগ থামিয়া গেলে আরও লোকজন আসিয়া পড়িতে পারে। তাহারা বন্দী



www.pathagar.com

হইলে কেদার রায় যে জীবন্ত প্রোথিত করিবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন দস্যুরা মন্দিরের ভিতর হইতে অতীব করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হুজুর! আমাদিগকে আল্লার ওয়াস্তে মাফ করুন। আমরা নরাধম প্রতাপাদিত্যের প্ররোচনায় বড়ই অন্যায় কার্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছিলাম। আমাদের সমুচিত শিক্ষা ও দন্ড হয়েছে। দোহাই আপনার, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মা কালীর নামে শপথ করছি, জীবনে কদাপি আর এমন কার্যে লিপ্ত হ'ব না।"

দস্যুদের কাতরোক্তি শুনিয়া বীর যুবক হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে ঝটিকা যেন ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। যুবক বলিলেন, "রে নরাধম পাষন্ডগণ, তোদের মত কাপুরুষগণকে বধ ক'রে কোন মুসলমান কখনও তাঁর তরবারিকে কলঙ্কিত করেন না। কিন্তু সাবধান! আর কখনও পরস্ত্রী বা কন্যা হরণ-রূপ জঘন্য কার্যে লিপ্ত হস্ না। এখন তোরা মন্দিরের প্রদীপ জেলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে আমার সম্মুখ দিয়ে একে একে বের হয়ে চলে যা। আমি তোদের অভয় দিচ্ছি। খোদা তোদের সুমতি দিন। খোদা সর্বদা জেগে আছেন, ইহা বিশ্বাস করিস। আমি খিজিরপুরের ঈসা খাঁ। বিশেষ কোনও প্রয়োজনে মুরাদপুরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপূর্ব কৌশল। তিনি আমাকে পথ ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছেন। তাই আজ কেদার রায়ের কন্যা রক্ষা পেল এবং তোরা সমুচিত শিক্ষা লাভ ও শাস্তি ভোগ করলি!"

দস্যুরা বার ভূঁইয়ার অধিপতি প্রবলপ্রতাপ নবাব ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর নাম শুনিয়া আরও বিস্মিত, চমৎকৃত এবং ভীত হইয়া পড়িল। করুণ কণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হুজুর! আমাদের বেআদবী মাফ করুন! হুজুরকে আমরা চিনতে পারি নাই। হুজুরকে চিনতে পারলে, আমরা তখনই হুজুরের পায় আত্মসমর্পণ করতেম। তা আমাদের মত ছোটলোক হুজুরকে চিনবে কি ক'রে, হুজুর! আমরা এ কাজে প্রথমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। মহাপাতক মনে করে ভীত হয়েছিনু। কিন্ত আমাদের দেশের রাজসভার সেই বড় বামুন ঠাকুর আমাদের সামনে তার লম্বা টিকি নেড়ে তালপাতার কি এক সংহিতা না পুঁথি খুলে বল্লে যে, 'কন্যা চুরি করে বিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এতে কোন পাতক নেই।' তাই আমরা রাজী হয়ে এক বৎসরকাল দাঁও খুঁজে বেড়াচ্ছিনু। আজ সুযোগ পেয়েছিনু! কিন্তু খুব শিক্ষা হল।"

ঈসা খাঁ স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে তেজের সহিত বলিলেন, "সে বামুন ঠাকুর হয়ত শাস্ত্রের কিছু জানে না। শাস্ত্রে এমন পাপ-কথা লেখা থাকে না। যদি থাকে তবে তা শাস্ত্র নয়।"

দস্যুঃ আজ্ঞে, আমাদের শাস্ত্রে নাকি সেরূপ বিধি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। অর্জুন আবার ভগবানের ভগ্নী সুভদ্রাকে নাকি হরণ



www.pathagar.com

করে বিয়ে করেছিলেন।

ঈশা খাঁঃ আরে, সে গর্ভস্রাব ব্রাহ্মণ তোদের ফাঁকি দিয়েছে। সে বেটা দেখ্‌ছি তোদের শাস্ত্রের মর্ম বোঝে নাই। অথবা টাকার লোভে কূটার্থ করেছে। বর ও ক'নে যদি উভয়ে উভয়কে নিজ ইচ্ছায় স্বামী-স্ত্রীরূপে বরণ করে থাকে, আর কনের পিতামাতা যদি কনের সেই বিবাহের প্রতিবাদী হয়, তবে সেই কন্যাকে হরণ করে নিলে পাপ হয় না। কিন্তু সে যে প্রাচীনকালের ব্যবস্থা।

দস্যুঃ "আজ্ঞে এতক্ষণে বুঝ্‌নু। হজুর ঠিক বলেছেন। হজুর দেখছি সেই বামুন ঠাকুরের চেয়ে আমাদের শাস্ত্র ভাল বুঝেন। হজুর! আমরা আর এমন পাপকর্ম কখনই করবো না।" দস্যুরা এই বলিয়া প্রদীপ জ্বালাইল এবং অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া কম্পিত পদে বাহির হইল। ঈসা খাঁ প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, পাঁচজন আহত তখনও জীবিত আছে। দরদর ধারায় তাহাদের রক্তস্রাব হইতেছে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থায় প্রাণে বড়ই ক্লেশ বোধ করিলেন। দুঃখে বলিলেন, "হা হতভাগারা! এমন কার্য কেন কোর্তে এসেছিলি!" তৎপর নিজের বহুমূল্য উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া স্বহস্তে তাহাদের আহত স্থানে পটী বাঁধিয়া দিলেন। দস্যুরা ঈসা খাঁর মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। একজন রাজার যে এতখানি বীরত্বের সহিত এতখানি দয়া থাকিতে পারে, তাহা প্রতাপাদিত্যের মত পাষন্ড দস্যু-ব্যবসায়ী রাজার রাজ্যবাসী লোকের পক্ষে ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না। ঈসা খাঁ পটী বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন তোরা শীঘ্র শীঘ্র পালা। রাত্রি প্রভাত হলে কেদার রায়ের এলাকায় থাকা নিরাপদ নহে।"

দস্যুরা দ্রুতপদে বর্ষাপ্লাবন-তাড়িত শৃগালের ন্যায় যারপর নাই শোচনীয় অবস্থায় দ্রুতপদে সেই দুর্যোগের মধ্যে প্রস্থান করিল।

ঈসা খাঁ অতঃপর মন্দিরের মধ্যে সেই জলসিক্ত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। প্রদীপের আলোতে দেখিলেন পাঁচজন পর্তুগীজ দস্যু এবং দুইজন হিন্দু দস্যু নিহত হইয়া বীভৎস অবস্থায় সেই মন্দিরের তলে পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন্দির রক্তে ভাসিতেছে। ঈসা খাঁ সেই সাতটি দেহ লইয়া বাহিরে দূরে রাস্তার পার্শ্বে একটা গর্তে ফেলিয়া দিলেন। তারপর বাহির হইতে অঞ্জলি করিয়া জল সেঁচিয়া মন্দিরের ভিতর যথাসম্ভব ধুইয়া ফেলিলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঈসা খাঁর পদস্পর্শ করিল। তাহার পর হাস্যমুখে বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন।"

ঈসা খাঁ বলিলেন, " সেজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সমস্তই তাঁর কৃপা।"

স্বর্ণঃ তা কি আর বলতে আছে। তার কুদরতের সীমা নাই। আমি যে আজ উদ্ধার পাব, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে আত্মহত্যার সংকল্প এঁটে বসেছিলাম; সমস্ত শরীর ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয়ে কাঁপিতেছিল, হয়ত এতক্ষণ আমি মৃতদেহে পরিণত হতেম। ধন্য খোদাতালা! কবি সত্যই বলেছেন-



www.pathagar.com

'কাদেরা কুদরত তু দারী হর্‌চে খাহি আঁ কুনী,
মোর্‌দারা তু জানে বখ্‌শি, জেন্দারা বে-জাঁ কুনী।

"হে মহিমাময়! ধন্য তোমার মহিমার অদ্ভুত কৌশল। তুমি মুহূর্তে জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত কর।"

ঈসা খাঁঃ আচ্ছা, তোমাদের এত রাত হল কেন? সঙ্গে কত লোক ছিল?

স্বর্ণঃ প্রথমত মাথাভাঙ্গা নদীর ঘাট পার হতে অনেক বিলম্ব হয়। খেয়া নৌকাখানি ভাঙ্গা ছিল। তারপর হরিশপুরের চটির কাছে এসে গরমের জন্য সকলেই বিশ্রাম করতে থাকে। সঙ্গে আটজন বেহারা, বারজন রক্ষী, তিনজন ভারী, দুইজন মশালচী এবং দাদা ছিলেন।

ঈসা খাঁঃ তোমার দাদাও ছিলেন? তিনি কোথায়? তিনি কি ঘোড়ায় ছিলেন?

স্বর্ণঃ হাঁ, তিনি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যেতেছিলেন।

ঈসা খাঁঃ তাঁকে ত দস্যুরা আক্রমণ করে নাই?

স্বর্ণঃ কেমন করে বলব? কয়েকবার তার উচ্চ চীৎকার শুনেছিলাম। সম্ভবতঃ তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে দূরে চলে গিয়েছেন।

ঈসা খাঁঃ তোমাদের এতগুলি লোক থাকতে, বিশেষতঃ বারজন রক্ষী, তাহাতে দস্যুরা আক্রমণ করিল কোন্ সাহসে?

স্বর্ণঃ আমাদের সকলেই অপ্রস্তুত ও গাফেল ছিল। দস্যু আক্রমণ করবে এ কখনই ভাবি নাই। সর্দার সঙ্গে আনা, কেবল ভড়ঙের জন্য। রক্ষীদের মধ্যে সকলেই চাঁড়াল, পর্তুগীজ ও বাগদী। ওরা যতই লম্ফঝম্প করুক না হঠাৎ বিপদে পড়লে ওরা একেবারেই হতবুদ্ধি হ'য়ে যায়। ওদের পাঁচজনের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু বন্দুকের নলের উপর লাঠি পড়বামাত্রই বন্দুক ফেলে পালিয়েছে। যা হউক, আপনি আর ভিজে কাপড়ে থাকবেন না, অসুখ কোর্তে পারে। আপনি বড়ই শ্রান্ত হয়েছেন। কাপড় বদলান। পাল্কীর ভিতরে আমার কয়েকখানি শাড়ী আছে।

স্বর্ণময়ী এই বলিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর হইতে কাপড় বাহির করিয়া দিল। ঈসা খাঁর সমস্ত বস্ত্রই ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত শাড়ী দুই ভাঁজ করিয়া তহবন্দের মত পরিলেন এবং আর একখানা লইয়া গায়ে দিলেন। স্বর্ণময়ী তাহার সিক্ত ইজার, পাগড়ী, চাপকান, কোমরবন্ধ প্রভৃতি নিংড়াইয়া দেওয়ালের গায়ে শুকাইতে দিল এবং পাল্কীতে যে গালিচাখানা বিছানো ছিল, তাহাই বাহির করিয়া মন্দির তলে বিছাইয়া দিল। ঈসা খাঁ গালিচায় ফারাগৎ মত বসিয়া একটু আরাম বোধ করিলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কী হইতে পানদানী বাহির করিয়া ঈসা খাঁকে দুইটি পান দিল। ঈসা খাঁ আনমনে পান চিবাইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী গালিচার এক প্রান্তে বসিয়া ঈসা খাঁর তেজোজ্জ্বল সুন্দর বদনমন্ডল পিপাসার্ত নয়নে পুনঃ পুনঃ



www.pathagar.com

দেখিতে লাগিল।

বাল্য ও কৈশোরের সেই সুপরিচিত মুখখানায় আজ যেন কি এক মদিরাময় সৌন্দর্য দেখিতে পাইল। তাহার শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর নিকট ঈসা খাঁ আজ যেন কি প্রিয়তম, মিষ্টতম এবং সুন্দরতম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ঘনঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। লজ্জায় তাহার মুখমন্ডল আরক্তিম হইল। প্রাণের ভিতরে ঈসা খাঁর জন্য কি এক তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী হৃদয়ে অনেকের কথা আলোচনা করিল, অনেকের মূর্তি মানসপটে অঙ্কন করিল, কিন্তু ঈসা খাঁর কাছে সকলেই মলিন হইয়া গেল। ঈসা খাঁর ন্যায় হৃদয়বান সুন্দর বীরপুরুষ, যুবতী আর কাহাকেও পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাইল না। ঈসা খাঁ বাল্যকাল হইতেই তাহাকে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ যেন সে আনন্দ শতগুণে উথলিয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ী ঈসা খাঁর সম্বন্ধে অনেক অনেক চিন্তা করিল। কত উজ্জ্বল স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। সেই পাঁচ বৎসর হইল, একদিন স্বর্ণময়ী শ্রীপুরের কৃষ্ণদীঘিতে সাঁতরাইতে গিয়া মাঝখানে ডুবিয়া মরিতেছিল। শত শত লোক পাড়ে দাঁড়াইয়া আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল। ঈসা খাঁ তাহাদের বাটীতে পুণ্যাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কতদিন রাজবাড়ীর ওস্তাদ মৌলানা ফখরউদ্দীনের নিকট নিজামীর সেকান্দর-নামা, জামীর জেলেখা এবং ফেরদৌসীর শাহ্‌নামার যে সমস্ত অংশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, ঈসা খাঁ তাহাকে তাহা কত সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই একবার রাজবাড়ীর নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি ভীষণ বাঘ আসিয়া কত লোককে খুন জখম করিতেছিল। বড় বড় শিকারীরাও হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে সাহস পাইতেছিল না। তারপর ঈসা খাঁ আসিয়া সকলের নিষেধ ও ভীতি অগ্রাহ্য করতঃ একদিন প্রাতঃকালে তরবারি-হস্তে যাইয়া বিনা হাতীতে বাঘ একাকী মারিয়া আনিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইত্যাকার বহু সুখ ও আনন্দময় স্মৃতি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল এবং ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয়ের সম্মুখে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও ক্ষমতাশালী হৃদয়বান পুরুষরূপে প্রতিভাত করিল। উষার আলোকে যেমন তাহার অপূর্ব যাদুকরী তুলিকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর চক্ষুর সম্মুখে নীলাকাশের নীরদমালাকে বিবিধ বিচিত্র মনঃপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়, তেমনি অতীতের স্মৃতি বর্তমান ঘটনার তুলিকায় বিচিত্র উজ্জ্বল রং ফলাইয়া যুবতীর মানস-চক্ষে ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয়ের প্রিয়তম, সুন্দরতম এবং শেষে আকাংক্ষিতজনরূপে অঙ্কিত করিল। যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার আপাদমস্তকে কি এক বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। যুবতী এতক্ষণ পর্যন্ত ঈসা খাঁর অনিন্দ্যসুন্দর তেজোদ্দীপ্ত বদনমন্ডল এবং সুদীর্ঘ কৃষ্ণতারা সমুজ্জ্বল ভাসা ভাসা চক্ষুর



www.pathagar.com

সৌন্দর্য–সুধা পান করিতেছিল। কিন্তু আর পারিল না, লজ্জা আসিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষুকে নত করিয়া দিল।

যুবতীর হৃদয়ের উপর দিয়া কত কি চিন্তার তুফান ও ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইসা খাঁ আনমনে পানই চিবাইতেছেন। পান চিবান শেষ হইলে– ছিবড়া ফেলিয়া যুবক একবার নেত্র ফিরাইয়া যুবতীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "স্বর্ণ! এখন কি করা যায়? বৃষ্টি ও তুফান এখনও ত সমানভাবে চলছে। তুমি পাল্কীর ভিতরে শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে। শেষে অসুখ করতে পারে। বৃষ্টি থামলে যা হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রবো।"

যুবকের আহবানে পুনরায় কি যেন একটা তড়িৎ স্রোত যুবতীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। যুবতী গলাধরা–স্বরে বলিল, "আমার ঘুম আসছে না। আপনি অনেক হয়রান হয়েছেন, আপনি বরং ঘুমান।" তারপর একটু থামিয়া যুবতী আবার বলিল, "আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, এখানে এ সময় কেমন করে এলেন?"

যুবকঃ কেন? সে কথা তুমি এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করছ যে?

যুবতীঃ আপনাকে পরিশ্রান্ত ভেবেই প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে আপনি যে মুরাদপুরে যাচ্ছিলেন, তখন তা দস্যুদিগকে বলেছিলেন।

যুবকঃ হাঁ, মুরাদপুরেই যাচ্ছিলাম। সেখানে একটা গ্রামের সীমা নিয়ে, আমার অধীন দুইজন জমিদারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। সেখানে পূর্বেই লোক পাঠিয়েছি। আরো লোক সঙ্গে ছিল। ঝড় উঠে এলে, আমি ভট্টাচার্যদের বাড়ীতে আশ্রয় নেবার জন্য দ্রুতগতিতে অশ্ব চালনা করায় তারা পিছনে পড়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই রাস্তায় এসে পড়ি। মন্দিরের নিকটবর্তী হলে, বহু লোকের কোলাহল শব্দ শুনে ও গবাক্ষের ভিতর দিয়ে গৃহের আলো দেখে এখানে আশ্রয় নেব মনে করে ঘোড়া হতে নামি। এটা যে শিবমন্দির তা অন্ধকারে কিছু টের পাইনি। আমি বৈঠকখানা মনে করেছিলাম। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখবর্তী হইবামাত্রই প্রতাপাদিত্যের লোকেরা তোমাকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, তা তাদের কথা থেকে বেশ বুঝতে পেলাম। ব্যাপার গুরুতর মনে করে আমি ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি এই সম্মুখের গাছের নীচে রেখে বিদ্যুতালোকে মন্দিরটি একবার বেশ ভাল করে দেখে নিলাম। দেখলাম যে, একটি ব্যতীত মন্দিরের দ্বিতীয় দ্বার নাই। দস্যুদের পালাবার কোন উপায় নাই। তখন দ্বারে পদাঘাত করি।

যুবতীঃ ধন্য আপনার হৃদয়! ধন্য আপনার সাহস ও বীরত্ব!! আপনি একাই এতগুলি দস্যুকে আক্রমণ করে জয়লাভ করলেন। ভগবান আপনার দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল করুন।

যুবকঃ এ আর বেশী সাহসের বা বীরত্বের কি, স্বর্ণ! দস্যুরা বলশালী হলেও,



www.pathagar.com

অন্তরে তারা অত্যন্ত ভীরু। যারা পাপকার্য করে, তারা মানসিক বলশূন্য। বাহিরে তারা যতই আস্ফালন করুক না কেন, ভিতরে অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত। আর তোমাকে বিপদগ্রস্ত দেখে, তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য আমার এমন উত্তেজনা এসে পড়েছিল যে, আমি তখন আমার নিজের কোনও বিপদের বা দস্যুদের সংখ্যার বিষয় আদৌ খেয়াল করি নাই।

যুবতীঃ আপনি আমাকে দু'বার রক্ষা করলেন।

যুবকঃ আমি কে, যে রক্ষা করব? খোদা রক্ষা করেছেন। আর দু'বার কোথায়?

যুবতীঃ খোদাই রক্ষা করেন সত্য, কিন্তু আপনি ত উপলক্ষ বটেন। দু'বার নয় কেন? এই একবার, আর সেই যে কৃষ্ণদীঘি থেকে; ভুলে গেছেন নাকি?

যুবকঃ না, ভুলে যাইনি। কিন্তু সেবার আরো লোক ত তোমাকে তুলবার জন্য জলে ঝেঁপে পড়েছিল।

যুবতীঃ পড়েছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পরে, আপনি তখন আমাকে তুলে নিয়ে দীঘির প্রায় কেনারায় এসেছিলেন। আপনি না তুল্‌লে সেদিন আর একটুতেই ডুবে যেতাম।

যুবকঃ তুমি যাতে ডুবে না যাও, সেই জন্যই খোদা আমাকে তখন ওখানে রেখেছিলেন। কেন? সে কথা এখন তুল্‌লে যে!

যুবতীঃ না, এমনি মনে প'ল। তবে আমি যখনি বিপদে পড়ি, তখনই যে খোদা আপনাকে আমার উদ্ধারকর্তা ক'রে পাঠান এ এক চমৎকার রহস্য।

ইহা বলিয়া যুবতী মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের দিকে আনমনে একবার দৃষ্টি করিল এবং মনে মনে কি যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

যুবকঃ তাঁর সবই রহস্য। তাঁর কোন্ কার্যে রহস্য নাই? তাঁর সবই বিচিত্র। ভাবলে অবাক হতে হয়।

যুবতীঃ যা হ'ক, আপনি না এলে, উঃ! কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হ'ত! আপনাকে দেখে আমার বড়ই সুখ ও আনন্দ হচ্ছে। আপনার কথা আমরা সর্বদাই স্মরণ করি। এবার পুণ্যাহে কত বিনয় করে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হল; তথাপি এলেন না। আপনি না আসায় পুণ্যাহের আমোদও তেমন হয় নাই। আপনি আসবেন বলেই মালাকরেরা কত ভাল ভাল বাজি তৈয়ার করেছিল। বাবা আপনার জন্য কত দুঃখ প্রকাশ করলেন।

যুবকঃ কি করবো স্বর্ণ! তোমাদের ওখানে আসতে আমারও খুব আনন্দ ও ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেব্‌লা সাহেবের মৃত্যুর পর হতে বিষয়কর্ম নিয়ে এমনি ফ্যাসাদে পড়েছি যে, একটু ফরাগৎ মত দম ফেলবারও আমার অবসর নাই। সর্বদাই মহালে বিদ্রোহ হচ্ছে। সীমা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই চলছে। দায়ুদ খাঁর পতনের পরে



www.pathagar.com

বাঙ্গালা দেশ কেমন অরাজক হয়ে পড়েছে। এদিকে আকবর শাহ্ সমস্ত বাঙ্গালা এখনও দখল করতে পারেননি।

যুবতীঃ যাক্, সে সব কথা। আপনার বিবাহের কি হচ্ছে?

যুবকঃ এখনও বিবাহের কিছু হয়নি। কিছু হ'লে তোমরা তা জেয়াফতই পেতে। মা মাঝে মাঝে বিবাহের কথা বলেন। তবে আমি এখনও বিবাহ সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ভাবি নাই।

যুবতীঃ এত বয়স হয়েছে। এখনও বিয়ে করবেন না?

যুবকঃ তা আর বেশী কি? এই ত সবে পঁচিশে পড়েছি। আমাদের মধ্যে ৩০ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রায় বিয়ে হয় না। হিন্দুদের মত আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই।*

যুবতীঃ বাল্য বিবাহটা বড়ই খারাপ!

যুবকঃ নিশ্চয়ই। তাতে দম্পতির স্বাস্থ্যই যে কেবল নষ্ট হয়, তা নয়। তাদের সন্তানেরাও অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণজীবী এবং রোগপ্রবণ হয়। যেসব দোষের জন্য তোমাদের হিন্দুরা মুসলমানের অপেক্ষা দুর্বল, সাহসহীন ও ভীরু, তাহার মধ্যে এও একটি প্রধান কারণ।

যুবতীঃ কিন্তু আপনার এখন বিবাহ করা উচিত।

যুবকঃ তা দেখা যাবে।

যুবতীঃ খুব সন্দুরী ও প্রেমিকা দেখে বিয়ে করবেন।

যুবকঃ সুন্দরী ও প্রেমিকা ত চাইই বটে। কিন্তু বিয়ে করলে বলিষ্ঠা ও সাহসিনী দেখেও করা চাই।

যুবতীঃ কেন?

যুবকঃ তা'হলে সন্তানাদিও বলিষ্ঠ ও বীরভাবাপন্ন হবে।

যুবতীঃ আপনার ছেলে এমনি বীরপুরুষ হবে। আপনার সাহস ও বীরত্বের চার ভাগের এক ভাগ পেলেই সে ছেলে বাঘ আছড়িয়ে মারবে।

যুবকঃ কেবল পিতা বীরপুরুষ হলেই হয় না, মাতাও বীর্যবতী ও সাহসিনী হওয়া চাই।

যুবতী ঃ তা'হলে স্ত্রীলোকদিগেরও শারীরিক নানা প্রকার ব্যায়াম এবং অস্ত্রচালনা-কৌশল শিক্ষা করা চাই।

যুবকঃ নিশ্চয়ই।

---

* ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান সমাজে বাল্য-বিবাহ অজ্ঞাত ছিল।



www.pathagar.com

যুবতীঃ তা'হলে আপনাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও ব্যায়াম-চর্চা করে?

যুবকঃ হাঁ, সম্ভ্রান্ত বংশের সকল স্ত্রীলোককেই যুদ্ধ শিখ্‌তে হয়। আগে এ প্রথা আরও বেশী ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এসে মুসলমানেরাও কেমন বিলাসী, অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যুবতীঃ আমি ত একটু তীর ও তরবারি চালনার অভ্যাস করেছি। কিন্তু বাবা ব্যতীত আর সকলেই তার জন্য আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে- বলে যে, "মর্দামী শিখছে।"

যুবকঃ তবে ত আজ দস্যুরা বড় বেঁচে গেছে!

যুবতীঃ আপনি বিদ্রুপ কচ্ছেন, কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র থাকলে আমি দস্যুদিগের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করতেম।

যুবকঃ বেশ কথা! আমি শুনে খুশী হলেম। এইবার একটা বীর পুরুষ দেখে বিয়ে দিতে হবে। দেখো শেষে কোনো কাপুরুষকে না শাদী কর।

যুবকের কথা শুনে যুবতীর গোলাপী গন্ড লজ্জার আক্রমণে পক্ব বিম্ববৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। যুবতীর গন্ডে ও চক্ষে লজ্জার আবির্ভাব হইলেও, মনটা কেমন যেন একটা আনন্দ-রসে সিক্ত হইয়া গেল।

এদিকে বৃষ্টি ধরিয়া যাওয়ায়, ঈসা খাঁ যুবতীকে বলিলেন, "স্বর্ণ! তুমি এখন শোও! আমি বাইরে যেয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখে আসি।"

যুবক এই বলিয়া দ্বার খুলিযা বাহিরে গেলেন! দেখিলেন মেঘ-বিমুক্ত আকাশ নির্মল নীলিমা ফুটাইয়া তারকা-হারে সজ্জিত হইয়া হাস্য করিতেছে। পূর্বদিকে দশমীর চন্দ্র ক্ষুদ্র একখন্ড কৃষ্ণ জলদের শিরে চড়িয়া বৃষ্টিস্নাতা পৃথিবী-সুন্দরীর পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। নববধূ অতি প্রত্যুষে গোপন স্নানান্তে ঘাট হইতে বাটী ফিরিবার পথে নন্দার সহিত দেখা হইলে যেমন লজ্জায় ও হৃদয়-চাপা আনন্দে ঈষৎ আরক্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সদ্যস্নাতা ধরণী-সুন্দরীও তেমনি চন্দ্র দর্শনে আনন্দে স্ফীত-বক্ষা ও প্রফুল্লমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

বৃষ্টি-বিধৌত বৃক্ষের নির্মল শ্যামল পত্রগুলি বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া চাঁদের কিরণে চিক্‌চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। জোনাকীগুলি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া চারিদিকের ছোট ছোট গাছপালা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া উড়িয়া বাহার দিয়া ফিরিতেছে। মাঝে মাঝে বাতাস আসিয়া গাছপালার পত্রস্থ জল ঝাড়িয়া মাথা মুছাইয়া দিতেছে। যুবকের শাদা ঘোড়াটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া গা ঝাড়িতেছে। ঈসা খাঁ মন্দিরে ঢুকিয়া নিজের ভিজা ইজার লইয়া ঘোড়াটার গা মুছিয়া দিলেন। পরে তরবারি হস্তে লইয়া যুবতীকে বলিলেন, "তুমি পাল্কীর ভিতরে ঘুমাও, আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি একবার ভট্টাচার্য-বাড়ীতে আমার লোকজনের এবং তোমার দাদার অনুসন্ধান করে আসি।"

ঈসা খাঁ তরবারি হস্তে মন্দির হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ দূরে



www.pathagar.com

অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দূরে কে একজন অশ্বারোহণে ইতস্তত ফিরিতেছে। যুবক অগ্রসর হইলেন। অশ্বারোহী ঈসা খাঁকে তরবারি-পাণি দেখিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল, "কে ও।" ঈসা খাঁ কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহী কেদার রায়ের পুত্র বিনোদ।

ঈসা খাঁ আনন্দে বললেন, "বিনোদ! এস, ভয় নাই, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্বর্ণ ভাল আছে।" সহসা বিশ্বস্ত ও আত্মীয়তার প্রীতিমাখা কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিনোদ বিস্মিত অন্তরে ঘোড়া ছুটাইয়া নিকটে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া ঈসা খাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল। ঈসা খাঁ তাহাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। বিনোদ বলিল, "দাদা সাহেব! আপনি এ দুর্যোগে কোথা থেকে?" ঈসা খাঁ তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া মন্দির দেখাইয়া ভট্টাচার্য বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঈসা খাঁ ভট্টাচার্য-বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার সমস্ত লোকজন ভট্টাচার্য বাড়ীতে বসিয়া আছে। বাড়ীর কর্তা রজনী ভট্টাচার্য ঈসা খাঁকে সপরিবারে, পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে দেবতার ন্যায় সম্মান ও সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রজনী ভট্টাচার্যের আগ্রহে, ভদ্রতা ও খাতিরে, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ঈসা খাঁ তথায় আহার করেন ও রাত্রি যাপনে সম্মত হইলেন। লোক পাঠাইয়া বিনোদ ও রায়-নন্দিনীকে মন্দির হইতে আনিলেন। স্বর্ণময়ী অন্তঃপুরে পরমাদরে রমণীদিগের দ্বারা অভ্যর্থিতা হইল। রজনী ভট্টাচার্য একজন জমিদার। তিনি রাজার ন্যায় যত্নে ও আড়ম্বরে ঈসা খাঁ এবং তাহার সঙ্গীয় পঞ্চান্ন জন লোককে ভোজন করাইলেন।

রজনী প্রভাতে ঈসা খাঁ বেহারা ঠিক করিয়া স্বর্ণময়ীকে সাদুল্লাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর রজনী ভট্টাচার্যের ছেলে ও মেয়েকে ডাকিয়া প্রত্যেকের হস্তে জলপান খাইবার জন্য ১০টি করিয়া মোহর প্রদান করিয়া অশ্বারোহণে মুরাদপুরের দিকে দ্রুত ধাবিত হইলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কীর দরজার ফাঁকের মধ্য দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলিল, ততদূর পর্যন্ত তাহার প্রাণের আরাধ্য মনোমোহন-দেবতার ভুবনোজ্জ্বল অশ্বারূঢ় মূর্তি অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণের পিপাসার সহিত দেখিতে লাগিল। স্বর্ণ দেখিল, যেন কোন অপূর্ব সুন্দর স্বর্গীয় দেবতা তাহার হৃদয়-মন চুরি করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার গমন-পথের উপরিস্থ আকাশ, নিম্নস্থ ধরণী এবং দুই পার্শ্বের শ্যামল তরুলতা যেন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যেন আলোকের তরঙ্গ উঠিতেছে। স্বর্ণময়ী দেখিল সত্য সত্যই তাহার প্রিয়তম-সুন্দরতম এবং জগদ্বিমোহন। তারপর যখন ঈসা খাঁ দূর পল্লীর তরুবল্লী-রেখার অন্তরালে মিশাইয়া গেলেন, তখন সুন্দরী বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি প্রত্যাহার করিল। হৃদয় উচ্ছ্বসিত নদীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতসারে বক্ষের কাঁচলীতে পতিত হইল। যুবতী তাড়াতাড়ি পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতরে শুইয়া পড়িল। বাহিরের দৃশ্য দেখিবার আর ইচ্ছা হইল না। বেহারারা পাল্কী লইয়া দুই দিকের বিস্তৃত শ্যামায়মান ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া সাদুল্লাপুরের দিকে ছুটিয়া চলিল।



www.pathagar.com

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
## মাতুলালয়ে

ঈসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলী শ্রীমতী স্বর্ণময়ীকে সাদুল্লাপুর রওয়ানা করিয়া দিয়া মুরাদপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাদুল্লাপুরের জগদানন্দ মিত্র, স্বর্ণময়ীর মাতামহ। তিনি একজন প্রাচীন জমিদার। তাঁহার বয়স প্রায় নব্বই পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এখনও বৃদ্ধ বিনা চশমায় প্রদীপের আলোতে কাশীরাম দাসের মহাভারত অনায়াসে পড়িতে পারেন। লোকটির বেশ হাসিখুশী মেজাজ। আজকাল প্রায় ঠাকুর পূজা এবং ছিপে করিয়া পুকুরের মাছ ধরাতেই দিন কাটে।

তাঁহার দুই বয়স্ক পুত্র, বরদাকান্ত ও প্রমদাকান্ত। তাহাদের দুইজনের ঘরেও সাতটি মেয়ে ও পাঁচটি ছেলে জন্মিয়াছে। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমকান্ত, তাহার এক পিসীর সহিত কাশীতে বাস করে। তদ্ব্যতীত আর সকলেই বাড়ীতে। সুতরাং বাড়ীখানি ছেলেমেয়েদের কোলাহলে এবং অট্টহাসিতে বেশ গোলজার। স্বর্ণ এখানে আসিয়া পরম যত্নে ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার মামা ও মামীদের আদরে ও ভালবাসায়, মাতামহ এবং মাতামহীর স্নেহ ও যত্নে বাহিরে সুখানুভব করিলেও প্রাণের ভিতরে কি এক অতৃপ্তি ও শূন্যতা বোধ দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ঈসা খাঁর কথা এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিত না। ঈসা খাঁর বীর্য-তেজঃ-ঝলসিত বীরবপু ও অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমন্ডল, তাঁহার সেই মধুবর্ষিণী অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীর ভাষা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। ঈসা খাঁর সুন্দর-কমনীয় বীরমূর্তি তাহার হৃদয়ে এমন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছে যে, যুবতীর চিন্তা ও কল্পনা, হৃদয় ও মন ঈসা খাঁ-ময় হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়কে প্রবোধিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা ও যত্ন করিল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেখিল, ভুলিতে বসিলে স্মৃতি আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ জাগিয়া উঠে। হৃদয়ে যখন প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন উহাতে বাধা দিতে গেলে শিলা-প্রতিহত নদীর ন্যায় ভীষণ উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া ফেলে। পূর্বের লজ্জা ও সঙ্কোচ একেবারে উড়িয়া যায়। স্বর্ণ যখন সকল বালক-বালিকার মধ্যে বসিয়া নানা প্রকারে তাহাদের আনন্দ বিধান এবং তাহাদের ক্ষণিক কলহের বিচার করিতে বসে, তখন তাহার মানসিক অধীরতা কিছু চাপা পড়ে বটে, কিন্তু আবার একেলাটি বসিলেই প্রাণের আকুলতা দশগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ষার ভরা নদীর মত তাহার মন কি যেন এক চৌম্বক-আকর্ষণে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। হৃদয়ের পরতে পরতে, শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে কি যেন এক পিপাসার তীব্রতা হইতে স্বর্ণময়ী বুঝিতে পারিল,



www.pathagar.com

যৌবনকাল কি ভয়ানক! প্রেমের আকর্ষণ ভয়ঙ্কর বেগশালী। উহা এক মুহূর্তেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলাইয়া প্রেমাস্পদের পদে আত্মবিকাইয়া বসে। প্রেমাস্পদের মধ্যেই তখন তাহার জীবনের আশা ও নির্ভর, সুখ ও শান্তির সর্বস্ব দেখিতে পায়। রায়-নন্দিনীও দেখিতে পাইল, ঈসা খাঁ-ই তাঁহার জীবনের সর্বস্ব। এক একবার তাহাকে পাইবার আশায় হৃদয় আশ্বস্ত হইত, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিরাশায় তাহার অন্তর ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত। স্বর্ণ ভাবিত, "আমি ত তাঁহাকে দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু তিনি যদি তাহা না বুঝেন! অথবা আমি পৌত্তলিক কাফের-কন্যা বলিয়া যদি আমাকে গ্রহণ না করেন। কৈ! তাঁহাকে ত আমার প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।" আবার ভাবে, "না না, তিনি ত চিরকালই আমাকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন। যাহাকে এতকাল ভালোবাসিয়াছেন, সে যদি এখন তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করে, তবে কি তিনি আনন্দিত হইবেন না? নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।"

"ভালবাসা প্রেমে ঘনীভূত হইতে কতক্ষণ?" আবার নিরাশা তাহার কর্ণকুহরে গোপনীয়ভাবে বলে, "কি বিশ্বাস! পুরুষের মন!" আবার স্বর্ণকুমারী চঞ্চল-চিত্ত হইয়া উঠে। এইরূপ আশা এবং নিরাশায় স্বর্ণময়ীর জীবন কেমন যেন আনন্দবিহীন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্দশী। সন্ধ্যা বহিয়া গিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণ জলদখন্ড শ্রেণী বাঁধিয়া হিমালয় পানে ছুটিয়াছে। চতুর্দশীর চন্দ্র এক একবার মেঘের ফাঁক দিয়া নববধূর ন্যায় প্রেম-দৃষ্টিতে সুধাবর্ষণ করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে তখনি মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। জগৎ এক একবার জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেছে, আবার তরল আঁধারে ম্লান হইয়া যাইতেছে। বাতাস এক একবার থাকিয়া থাকিয়া উঁচু গাছের উপর দিয়া পাতাগুলিকে করতালির মত বাজাইয়া বহিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও বাগানের নানা জাতীয় ফল-ফুলের গাছের মধ্যে এলোমেলোভাবে বহিয়া যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। ম্লান কৌমুদী-মাখা পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া শ্রুতি-মধুর তক্‌তক্ শব্দে পাড়ে যাইয়া লাগিতেছে। স্বর্ণময়ী এই বাগানের মধ্যস্থ পুষ্করিণীর পরিষ্কার বাঁধা ঘাটে বসিয়া জোৎস্নালোকে বকুলের সুদীর্ঘ মালা গাঁথিতেছে এবং গুন্‌গুন্ করিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার কি যেন মনে ভাবিয়া পুকুরের মৃদু লহরী-লীলার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেছে এবং বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। স্বর্ণময়ীর কণ্ঠ যদিও গুন্‌গুন্ করিতেছিল এবং চম্পক অঙ্গুলি যদিও বকুলফুলে সুতা পরাইতেছিল, তত্রাচ তাহার মন যেন কোন্ এক দেশের শোভন আকাশে পথভ্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আজকার চন্দ্রও যেন মেঘ-পটলে লুক্কায়িত, স্বর্ণময়ীর মুখমন্ডলেরও



www.pathagar.com

তেমনি দীপ্তি লাবণ্য অন্তর্হিত। তাহার বদনমন্ডল যেন কেমন এক প্রকার বিষাদ গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই গাম্ভীর্যের মধ্যেও তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাসে তাহার ললাট-প্রান্তস্থ কেশ-কলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগন্ড চুম্বন করিতেছিল। মালতীসুন্দরী স্বর্ণময়ীর মামাতো ভগ্নী। যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার দেহ-লতিকা যেমন পুষ্পিতা, মনও তেমনি সুরভিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ীকে সে আপনার হৃদয়ময় করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণকে সে হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর হইতে ভালোবাসে। স্বর্ণকে ভালোবাসিয়া সে নিজের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মালতী সন্ধ্যা হইতে বাটীর কোন ঘরে স্বর্ণকে খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে বাগানে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ করিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া মালতী দেখিল যে, স্বর্ণ একেলাটি বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মাল্য রচনা করিতেছে। সে অনেকক্ষণ স্বর্ণকে খুঁজিয়া পায় নাই, সুতরাং পুকুরপাড়ে স্বর্ণকে পাইয়া একবার তাহার সঙ্গে মজা করিবার লোভ মালতীর মনে অত্যন্ত বলবৎ হইয়া উঠিল। মালতী পশ্চাদ্দিক হইতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া নীরবে দাঁড়াইল। স্বর্ণ তখন ঈসা খাঁর মূর্তিধ্যানে প্রগাঢ় নিবিষ্ট, কাজেই অন্যমনস্কা; মালতীর আগমন টের পাইল না। মালতী হাসিমুখে স্বর্ণময়ীর মালাগাঁথা দেখিতে লাগিল। স্বর্ণ দু'গাছি মালা গাঁথিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল। মালতী তাহা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তুলিয়া লইয়া আপনার গলায় পরিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া বেদম হাসিয়া উঠিল। স্বর্ণ অন্যমনস্কা ছিল, সুতরাং প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তারপর মালতীর গলা ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিল। সে হাসি যেন আর থামিতে জানে না। সে বেদম হাসির চোটে সমস্ত বাগান ও পুকুরের জলও যেন অট্ট হাসিতে লাগিল। নিকটস্থ বকুল গাছের ডালের ঝোপে একটি কোকিল বোধ হয় নিদ্রা যাইতেছিল, শ্রীমতীদ্বয়ের হাসির চোটে আতঙ্কিত হইয়া কুহু কুহু করিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যাইয়া পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে আম্রবৃক্ষে আশ্রয় লইল। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ থামিলে স্বর্ণ মালতীকে বলিল, "কি লো! তুই এখানে মরতে এসেছিস্ কেন? আমাকে যে একবারে চম্‌কে দিয়েছিস? আমি তোর বর না কি লো? যে আমাকে ছাড়া একদন্ড থাক্‌তে পারিস না!"

মালতীঃ আমি ভাই মরতে আসি নাই, তোমাকে ধর্‌তে এসেছি। তোমাকে বর করতে কি আমার অমত? তুমি যদি বর হ'তে সাহস পাও, তাহলে আমি এখনই তোমাকে বরণ করি। কি বল? তোমার মত বর পেলে কি আর ছাড়ি?

স্বর্ণঃ বটে, বরের জন্য দেখছি তুই ক্ষেপে উঠেছিস। বেশী অস্থির হ'স না, সবুর কর-মেওয়া ফল্‌বে।

মালতীঃ তাই তো! আপন স্বপন পরকে দেখাও। বরের জন্য কে ক্ষেপে উঠেছে



www.pathagar.com

তা মালা গাঁথাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, আমরা বুঝি কিছু বুঝি না?

স্বর্ণঃ কি বুঝিস্ লো! মালা তো তোর জন্যই গাঁথছিলাম।

মালতীঃ বটে; আমার জন্য, না ঈসা খাঁর জন্য?

স্বর্ণঃ (কুপিত হইয়া) তুই এমন কথা বল্‌লি যে, জিব টেনে ছিঁড়ে দেব।

মালতীঃ কেন, আমি কি বলেছি? রোজই ত তুমি ঈসা খাঁর গল্প কর। তাঁর সাহস, তাঁর বীরত্ব, তাঁর ভালোবাসার কথা তুমিই ত বল।

স্বর্ণঃ বেশ্ ত আমি বলি, তাতে কি হয়েছে? তাঁর বীরত্বের কথা, তাঁর সাহস ও সৌন্দর্যের কথা এবং আমাকে যে তিনি দুইবার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তা আমি এক-শ বার বল্‌বো। তাতে দোষ কি?

মালতীঃ তবে আমি কি দোষের কথা বলেছি?

স্বর্ণঃ তুই মালা দেওয়ার কথা বল্‌লি কেন?

মালতীঃ ভারি ত অপরাধ! না-পছন্দ হল কিসে?

স্বর্ণঃ না-পছন্দ বা অযোগ্যের কথা কে বলেছে?

মালতীঃ বাঃ! বাঃ! তবেই ত তোমার পছন্দ ও যোগ্য হয়েছে দেখ্‌ছি। তাই ত আমি মালা দিতে বলছি।

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল, "ওলো! তিনি যে মুসলমান, আর আমি যে হিন্দু।"

মালতীঃ হলই বা হিন্দু আর মুসলমান। আজকাল ত হিন্দু-মুসলমানে খুবই বিয়েহচ্ছে।

স্বর্ণঃ কোথায় খুব হচ্ছে?

মালতীঃ কেন? এই ত ভুলুয়ার ফজল গাজীকে রামচন্দ্রপুরের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কন্যা দিয়েছে। বাখরগঞ্জের হাশমতুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে বাঁশজোড়ের চক্রবর্তীদের মেয়ে শরৎকুমারীর বিয়ে ত গত পৌষেই হয়েছে। বামন ঠাকুরেরা এখন ত খুবই পক্ষতি দিচ্ছেন। তাঁরা ত বলছেন, "মুসলমান দেবতার জাতি, তাদের ঘরে মেয়ে দিলে অগৌরব বা অধর্ম নাই।" গত বৎসর সরাইলের জমিদার মথুরাকান্ত মুস্তফী ও আলমপুরের চৌধুরী শাহবাজ খানের মধ্যে কেন্দ্রপাড়া গ্রাম নিয়ে যে তুমুল বিবাদ-বিসম্বাদ হয়, সে বিবাদ মথুরাকান্ত মুস্তফীর কন্যা সরোজবাসিনীর সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের পুত্র আবদুল মালেকের বিবাহ দিয়েই ত মিটিয়ে ফেলা হ'ল। বাবা সে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি।

স্বর্ণঃ ওরূপ দুই চারটা ঘটনায় কি আসে যায়?

মালতীঃ কেন? দুই চারটা কোথায়? বাদশাহ নবাব ও উজিরদিগকে বড় বড় হিন্দু রাজ-রাজড়া কন্যা দিচ্ছেন।



www.pathagar.com

স্বর্ণঃ আরে ওসব রাজ-রাজড়ার ও তাঁদের কন্যাদের কথা ছেড়ে দে। তাঁদের সবই শোভা পায়।

মালতীঃ (হাততালি) বাঃ! বাঃ! আমিও ত সেই জন্যই ঈসা খাঁকে বরণ করতে বলছি। তুমি যে রাজা কেদার রায়ের কন্যা। তোমারও ত বেশ শোভা পাবে!

স্বর্ণ বড়ই অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইল। সে মনে মনে ভাবিল, আজ এরূপ হচ্ছে কেন? মালতী যে বড়ই জব্দ করতে আরম্ভ করল।

স্বর্ণকে অপ্রতিভ দেখিয়া মালতী বলিল, "তবে এইবার ঈসা খাঁকে মালা দেবে কেমন"?

স্বর্ণঃ তোর বুঝি মুসলমান বিয়ে করতে বড়ই সাধ?

মালতীঃ আমার সাধ হলেই বা কি? আমি ত রাজকন্যা নই। এ সাধারণ হিন্দু জমিদারের কন্যাকে কোন্ মুসলমান গ্রহণ করবে?

স্বর্ণঃ তুই যদি বলিস, না হয় আমি তার উপায় দেখি।

মালতীঃ আগে ভাই তুমি নিজের যোগাড় দেখ। কথায় বলে, 'মামা! আগে দেখ নিজেরধামা'।

স্বর্ণ মালতীর কথায় তাহার গালে এক মৃদু ঠোক্না দিতে অগ্রসর হইলে, মালতী নিজের গলা হইতে ফুলমালা লইয়া স্বর্ণের গলায় পরাইয়া দিল এবং চকিতে তাহার গণ্ড চুম্বন করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। স্বর্ণও তাহাকে ধরিবার জন্য বাতাসে আঁচল উড়াইয়া পুকুরের বাগান আলো করিয়া দ্রুত ছুটিল।



www.pathagar.com

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## পত্র

জ্যৈষ্ঠ মাস গতপ্রায়। আষাঢ়ের ১৭ই তারিখে মোহররম উৎসব। সেই মোহররম উৎসবের পরেই স্বর্ণময়ীকে পিত্রালয়ে ফিরিতে হইবে। স্বর্ণময়ী শিবনাথের মুখে আরও সংবাদ পাইল যে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধও পাকাপাকি হইয়াছে। রাজা এখন হইতেই বিবাহের আয়োজনে লিপ্ত। বিশেষ সমারোহ হইবে। শিবু অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্মিতমুখে স্বর্ণকে এই সংবাদ প্রদান করিলেও, বিবাহের কথায় স্বর্ণের বুক যেন ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন এত সজোরে চলিতে লাগিল যে, স্বর্ণের সন্দেহ হইল পাছে বা অন্যে শ্রবণ করে। স্বর্ণের মুখমন্ডল ম্লান হইয়া গেল। শিবনাথ ভাবিল, পাত্র কিরূপ তাই ভাবিয়া স্বর্ণময়ী চিন্তিত হইয়াছে। সুতরাং সে একটু কাশিয়া লইয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি! আর ভাবতে হবে না, সে পাত্র আমি নিজে দেখেছি। মহারাজও দেখেছেন। তাদের ঘর বেশ বুনিয়াদি। পাত্র দেখতে শুনতে সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর। বয়সও অল্প। তোমার সঙ্গে বেশ মানাবে। সেরূপ সুশ্রী সুন্দর পাত্র আমাদের এ অঞ্চলে আর নাই। তুমি একবার তাকে দেখলেই ভুলে যাবে।" শিবনাথ আনন্দের সহিত তাহাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করিবার জন্য এ সব কথা বলিলেও স্বর্ণের কর্ণে তাহা বিষের মত বোধ হইতে লাগিল। স্বর্ণ চুল বাঁধিবার ছল করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। ঘরে যাইয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। বালিশে সে অনেকক্ষণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। তারপর মুখ ধুইয়া মন স্থির করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করিল। সে বেশ চিন্তা করিয়া দেখিল, ঈসা খাঁ ব্যতীত তাহার প্রাণের একটি বিন্দুও এক মুহূর্তের জন্য কাহাকেও স্থান দিতে প্রস্তুত নহে। ঈসা খাঁ ব্যতীত তাহার জীবনের কোনও অস্তিত্ব নাই। সে দেখিল ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয় এরূপভাবে ধরিয়া বসিয়াছে যে, সমস্ত দেবতা এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হৃদয়ের সিংহাসন হইতে ঈসা খাঁকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ নহে।

যুবতী অনেক ভাবিয়া শেষে ঈসা খাঁকে পত্রযোগে আত্মসমর্পণের কথা জানাইবার জন্যই মন স্থির করিল। ভাবী বিপদের গুরুত্ব স্মরণে এবং হৃদয়ের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় লজ্জা দূরীভূত হইল। যুবতী পত্র লিখিয়া তাহা শিবনাথের দ্বারা খিজিরপুরে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিল। বলা বাহুল্য, পত্র পারস্য ভাষায় রচিত হইল। আমরা সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী পারস্য ভাষায় রচিত পত্রের বঙ্গানুবাদ দিতেছিঃ



www.pathagar.com

## পত্র

হে মহানুভব! প্রাণ-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। মানুষ মুখের ভাষা আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু প্রাণের ভাষা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। প্রাণের একটি আবেগ প্রকাশ করিতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা যখন এক নিঃশ্বাসে ফুরাইয়া যায়, তখন হে আমার প্রাণের আকাংখিত প্রিয় দেবতা! এ হৃদয়ের অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাস, অনন্ত দুঃখ-ব্যথা আমি কিরূপে প্রকাশ করি। তবে আশা আছে, বৃহৎ ব্যক্তি তর্জনী প্রদর্শনেই চন্দ্র এবং গোলাপের একটি পাপড়িতেই প্রেমিক-হৃদয় দর্শন করেন।

হে নয়নানন্দ! হে আমার জীবনাকাশের প্রভাত-রবি! আমার ত্রুটি ও বে-আদবী মার্জনা করিতে মর্জী হয়। হৃদয়ের নদী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, উহা অন্য নদীতে মিশিতে অক্ষম, উহা সমুদ্র ব্যতীত আর কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিবে না। গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু খিজিরপুরের বুলবুল ব্যতীত আর কাহাকেও সুরভি দান করিবে না। শ্রীপুরের সরোবরে যে কমল ফুটিয়াছে, তাহা খিজিরপুরের দেবতার জন্যই ফুটিয়াছে। চরণ-প্রান্তে স্থান পাইবার অযোগ্য হইলেও তাহার প্রেম-দেবতা তাহাকে যোগ্যতা দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কমলের অটল বিশ্বাস যে, তাহার দেবতা পরম হৃদয়বান ও দয়ালু। এ বিশ্বাস অটুট রাখিতে পাঠান দেবতা কি অগ্রসর হইবেন না? নলিনীকে অনেক বুঝান হইল, সে স্পষ্ট বলিল, "আমি সূর্য ব্যতীত কাহারও পানে তাকাইব না।" চকোরকে অনেক বুঝান হইল, সে ক্ষুদ্র হইলেও গর্বের সহিত বলিল, "চন্দ্র-সুধা ব্যতীত আমি আর কিছুই পান করিব না।" চাতককে অনেক বুঝান হইল, সে বলিল, "আমি জলদের জল ব্যতীত অন্য জল পান করিব না।" প্রেমের নিকট সকলেই পরাস্ত, প্রেম চির-বিজয়ী। অধিনীর তাহাতে দোষ কি?

হে দেবতা!

উন্মাদিনী তাহার হৃদয়ের পাত্রে প্রীতির ফুল সাজাইয়া চরণপ্রান্তে উপস্থিত। এক্ষণে তাহার পূজা গ্রহণ করিলে দুঃখিনীর জন্ম-জীবন সার্থক হইবে। যদি অনাদর কর-ফিরাইয়া দাও তাহাও ভাল, একটি হৃদয় ভস্ম হইয়া অনন্তে মিশিবে। কিন্তু তাহাতে কি? দেবতার কোনও কার্যে দোষ নাই। বৈশাখের মেঘ ইচ্ছা করিলে গোলাপের হৃদয় বজ্রানলে দগ্ধ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে তুষারশীতল সলিল-ধারায় তাহাকে স্নিগ্ধ করিতে পারে। সকলি মেঘের ইচ্ছা।

চরণপ্রান্তের ধূলি-আকাংক্ষিণী-
শ্রীপুরের মরু-তাপ-দগ্ধ গোলাপ
স্বর্ণময়ী।



www.pathagar.com

স্বর্ণ পত্র লিখিয়া তাহার একপ্রান্তে মুসলমানী কায়দামতে একটু আতর মাখাইয়া পুরু লেফাফায় বন্ধ করিল। তৎপর স্বহস্তের কারুকার্যযুক্ত এবং নানা প্রকারের পার্শি বয়েত অঙ্কিত একখানি সুন্দর রেশমী রুমালে তাহা বেশ করিয়া বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিল। শিবনাথ পত্র পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এ কিসের পত্র?" বাড়ীর আরও সকলে, বিশেষতঃ মালতী পুনঃ পুনঃ সিজ্ঞাসা করিল, এ কিসের পত্র? স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঈসা খাঁ আমাকে সেই রাতে দস্যু-হস্ত থেকে উদ্ধার করে প্রাতঃকালে সাদুল্লাপুরে রওয়ানা করবার সময় বলেছিলেন, 'সাদুল্লাপুরে তোমার মঙ্গল মত পহুঁছান-সংবাদ আমাকে জানিও।' এতদিন লোকাভাবে তা জানাতে পারি নাই। বড়ই বিলম্ব হয়েছে। অত বড় লোক, বিশেষতঃ আমাকে যেরূপ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, তাতে কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।"

স্বর্ণের ছোট মামী পার্বতীসুন্দরী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছি! তোমার কোন বিবেচনা নাই। বারভূঞার দলপতি ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর কাছে রাজরাজড়ারা জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাঁকে তুমি এত বিলম্বে মঙ্গল-সংবাদ দিতেছ? তিনি যে তোমাকে মঙ্গল-সংবাদ দিতে বলেছেন, তা তোমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। শিবনাথ এতদিন এখানে নাই বা ছিল, আমাদের বাড়ীতে কি অন্য লোকজন ছিল না? রাজার মেয়ে হয়েছ, বুদ্ধিটা একটু গম্ভীর কর। এলে তুমি বৈশাখ মাসে, আর মঙ্গল-সংবাদ দিচ্ছ জ্যৈষ্ঠের শেষে।"

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া বলিল, -"কি জানি মামী, আমার বড় ভুল হয়ে গেছলো, আমি সে জন্যে পত্রে ত্রুটি স্বীকার করেছি।"

স্বর্ণ এই বলিয়া শিবনাথকে বিদায় করিয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, "নবাব বাড়ীর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস যে, "শ্রীপুরের রাজবাড়ী হ'তে আসছি।" তা'হলে অনায়াসেই নবাবের কাছে যেতে পারবি। পত্রের উত্তর নিয়ে আসা চাই। উত্তর আনলে বখশিশ পাবি।" শিবনাথ উপদিষ্ট হইয়া, ঘাড়ে লাঠি ফেলিয়া কোমরে চাপরাস বাঁধিয়া একরাশি বাবরী চুল কাঁকাইতে কাঁকাইতে খিজিরপুরের দিকে রওয়ানা হইল।



www.pathagar.com

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ
## খিজিরপুর প্রাসাদে

যথাসময়ে শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর পত্র বহন করিয়া শিবনাথ কৈবর্ত খিজিরপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সূর্য তখন নীল আকাশের গায়ে নানা বর্ণের নানা রকমের মনোহর মেঘের পট আঁকিয়া পশ্চিম-সাগরে ডুবুডুবু প্রায়। এক রাত্রির জন্য বিদায় লইতেও সূর্যের মন যেন সরিতেছে না; তাই সবিতৃদেব ডুবিতে ডুবিতেও সতৃষ্ণনয়নে পৃথিবী-সুন্দরীকে সহস্র কিরণ-বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। খিজিরপুরের নবাব বাটীর বহির্বাটীর তোরণ অতিক্রম করিয়াই শিবনাথ দেখিতে পাইল, অন্যূন এক মাইল লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত প্রকান্ড রাজবাটী। শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে সমস্ত বাড়ীটা এমন পরিষ্কার চুণকাম করা ও ধবধবে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন শ্যামল তৃণতলে রাজহংসের ডিম্বশ্রেণী শোভা পাইতেছে। অসংখ্য চূড়া, গম্বুজ ও মিনারের রৌপ্যকলস ও ছত্রে তপনের শেষ স্বর্ণরশ্মি পড়িয়া ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে তিন শত গজ চওড়া এবং দেড় মাইল লম্বা এক স্বচ্ছতোয়া দীঘি। সুবিশাল স্বচ্ছ জলরাশিতে অসংখ্য প্রকারের জলজ কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদু মারুত-হিল্লোল-উত্থিত তরঙ্গরাজির সহিত তালে তালে দুলিতেছে। দূর দূরান্তর ব্যাপিয়া সে এক চমৎকার শোভা। সূর্যের হৈমাভ্য পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে। লহরে লহরে কবিত্ব গড়াগড়ি যাইতেছে। অসংখ্য মৎস্য মনের আনন্দে কুর্দন করিতেছে। সরোবরের মধ্যস্থলে এক লৌহ-সেতু দ্বারা উভয় তীর সংযুক্ত। সেতু পার হইয়া আসিয়া সরোবরের তুল্য এক বিরাট রমণীয় পুষ্পোদ্যনে প্রবেশ করিতে হয়। এই সুবিশাল উদ্যানে পৃথিবীর সকল দেশের নানা প্রকার পুষ্পের বৃক্ষ, লতাগুল্ম সংগৃহীত হইয়াছিল। বাগানে সহস্র সহস্র পুষ্পস্তবক ফুটিয়া সৌন্দর্যে দিগন্ত আলোকিত এবং সৌরভে গগন পবন আমোদিত করিত। তিন শত ভৃত্য বাগানের মালীর কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই বাগানের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়া পড়িত। মুসলমানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও পুষ্প-প্রিয়তা ঈসা খাঁতে বেশ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। নানা জাতীয় সুকণ্ঠ ও সুন্দর বিহঙ্গ এই চির বসন্ত সেবিত উদ্যানে বিরাজ করিত। এই উদ্যানের মধ্যেই ষাট গম্বুজী বিরাট মসজিদ। উহা আগাগোড়া রক্তপ্রস্তরে নির্মিত। কেবল জমি সবুজ মর্মরের। ভূতল হইতে গম্বুজের শীর্ষ এক শত ফিট উচ্চ। প্রত্যেক গম্বুজের মস্তকে সুবর্ণ-কলস শোভা পাইতেছে। মসজিদের চারি পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরের চারিটি মিনার। প্রত্যেকটির উচ্চতা একশত পঁচিশ ফিট। মসজিদ একশত গজ দীর্ঘ এবং আশি গজ প্রশস্ত। সম্মুখের চত্বর পরিমাণে



www.pathagar.com

ইহার দ্বিগুণ। মসজিদের চত্বর ভূমি হইতে পাঁচ হাত উচ্চ। চারিদিক প্রশস্ত সোপান শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। সোপান-শ্রেণীর উপরে সুন্দর টবে ঋতু-পুষ্পজাল ফুটিয়া অপূর্ব বাহার খুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকরের উৎস নানা ভঙ্গিমায় নির্মল জলধারার উদ্‌গার করিতেছে। শিবনাথ যাহা দেখিতেছে, তাহা হইতেই আর সহসা আঁখি ফিরাইতে পারিতেছে না। সে পূর্বে কেদার রায়ের বাড়ীকেই পরম রমণীয় ও সুবৃহৎ বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এক্ষণে ঈসা খাঁর উদ্যান ও প্রাসাদ দেখিয়া কেদার রায়ের শ্রীপুরের বাটী তাহার নিকট শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শিবনাথ দেখিল, মসজিদে অন্যূন্য তিন হাজার লোক মাগরেবের নামাজ পড়িতেছে। সে সেই বিরাট মসজিদের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া ভক্তিভরে সেজদা করিল।* বাগান পার হইয়া পুনরায় সিংহদ্বার। শিবনাথকে ঈসা খাঁর নামীয় পত্রবাহক দেখিয়া প্রহরী বলিল, "এখানেই দাঁড়াও, নবাব সাহেব নামাজ পড়তে গিয়েছেন, এখনই আসবেন।" এখানে আমরা আমাদের পাঠকগণকে জানাইয়া রাখি যে, ঈসা খাঁকে পূর্ব-বাঙ্গালার সকল লোকেই বারভূঞার নবাব বলিয়া আহবান করিত। বস্তুতঃপক্ষেও তিনি একজন নবাবের তুল্য লোকই ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চান্ন লক্ষের উপর ছিল। আজকার হিসাবে পাঁচ কোটিরও বেশী। ঈসা খাঁর সাত হাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক, দুইশত রণতরী এবং দেড়শত তোপ ছিল। অশ্বশালায় সাত হাজার অশ্ব এবং হস্তিশালায় পাঁচশত হস্তী সর্বদা মওজুদ থাকিত। প্রত্যহ পাঁচশত ছাত্র তাঁহার প্রাসাদ হইতে আহার পাইত। একশত পঁচানব্বই জন জমিদার তাঁহার অধীন ছিল। তিনি দশ বৎসর কাল অরাজকতার জন্য বাঙ্গালার নবাব সরকারের রাজস্ব দিয়াছিলেন না। তাহাতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা তাঁহার রাজকোষে সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যে দুই হাজার পুষ্করিণী, তিন হাজার ইঁদারা, দুইশত পান্থশালা এবং ষাটটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানদের চিরন্তন প্রথানুসারে এই সমস্ত মাদ্রাসা অবৈতনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পঞ্চাশটি টোলের অধ্যাপকগণের প্রত্যেকে বার্ষিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেন। সেকালের এই একশত টাকা সাহায্য এ কালে হাজার টাকার তুল্য। তিনি তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে তিনশত মাইলের উপর রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু শিল্পদ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত তোপ, বন্দুক, তলোয়ার, ঘোড়ার জিন এবং কাঁচের দ্রব্য দিল্লীর বাদশাহী কারখানায় প্রস্তুত ঐ সমস্ত দ্রব্য হইতে নিকৃষ্ট হইত না।

---

* সেকালের হিন্দুরা মুসলমানের মসজিদ ও দরগাহ্ দেখিলে এই প্রকার সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল।



www.pathagar.com

ঈসা খাঁ নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে ফিরিতেই শিবনাথ কুর্নিশ করিয়া পত্র দিল। ঈসা খাঁ রুমাল খুলিয়াই বুঝিতে পারিলেন, স্বর্ণময়ীর পত্র। পত্রখানি হাতে লইতেই ঈসা খাঁর আপাদমস্তকে কি যেন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। ঈসা খাঁ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। পত্র খুলিয়া উপরের স্তরের লেখা পড়িয়াই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। শিবনাথের খাইবার থাকিবার ভালো বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হিন্দু-অতিথিশালার দারগাকে আদেশ করিয়া গেলেন। শিবনাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থাপিত বীর-পুরুষদের অশ্বারূঢ় প্রস্তর-মূর্তি দেখিতে দেখিতে অতিথিশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি এক প্রহর। ঈসা খাঁ হস্তীদন্ত-নির্মিত একখানি আরাম-কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন। গৃহের মধ্যে একশত ডালবিশিষ্ট ঝাড় জ্বলিতেছে। প্রকান্ড কক্ষ, কক্ষের ছাদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের লতাপাতায় সুশোভিত। ছাদের কড়ি, বরগা কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, প্রস্তরের কড়ি বরগা ছাদের সহিত অদ্ভুত কৌশলে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালে সুবৃহৎ দর্পণ, প্রস্তরের নানাবর্ণের ফুল এবং বহুমূল্য চিত্ররাজি শোভা পাইতেছে। সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার কৃপাণপাণি অশ্বারূঢ় বীর্যবতী মূর্তিখানি অতি চমৎকার শোভা পাইতেছে। রাজিয়া যেমন অতুলনীয়া সুন্দরী তেমনি অসাধারণ সাহসিনী ও তেজস্বিনী। তাঁহার মুখ-চোখ হইতে প্রতিভার আলো যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। আর একটি চিত্রে মহাবীর রোস্তম তরবারির আঘাতে এক ভীষণ আজদাহা সর্পকে বিনাশ করিতেছেন। রোস্তমের অসাধারণ বীরত্ব ও তেজ ছবিতে চমৎকার রূপে ফুটিয়াছে। আর একটি চিত্রে উদ্যান মধ্যে বসিয়া 'মজনু' বীণা বাদন করিতেছেন; দুঃখিনী প্রেমোন্মাদিনী 'লায়লা' সেই মধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। লায়লার দুই চক্ষু বহিয়া তরল মুক্তাধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। উদ্যানের ফুল ও পক্ষীগুলি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে ফরহাদ প্রেমোন্মত্ত চিত্তে পাহাড় কাটিতেছেন। অনবরত দৈহিক পরিশ্রমে ফরহাদের সুকুমার তনু ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শিরী বিষণ্ন চিত্তে করুণনেত্রে দুরস্থ প্রাসাদের ছাদ হইতে তাহাই দর্শন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রিয়তমের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির কি ভুবনমোহন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে!

একখানি চিত্রে একজন দরবেশ স্থানীয় লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁহার সহায়তা করিতে আহবান করিতেছেন। সমবেত লোকগণ সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ। কিন্তু ষোড়শবর্ষ বয়স্ক এক যুবক স্বর্গীয় দীপ্তিঝলসিত তেজোময়ী মূর্তিতে দন্ডায়মান হইয়া বিশ্বাসের কলেমা পাঠ করতঃ অসি উত্তোলনপূর্বক আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছেন। আর একখানি চিত্রে বালক রোস্তম, এক মত্ত শ্বেতহস্তীকে পদাঘাতে বধ



www.pathagar.com

করিতেছেন। একখানি চিত্রে রাজ্যচ্যুত ছদ্মবেশী ইরানেশ্বর জামশেদ, জাবলস্তানের উদ্যানে শিলাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে জাবলস্তানের অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী রাজকুমারী তাঁহাকেই স্বকীয় আকাংক্ষিত প্রেমাস্পদ জামশেদ জ্ঞানে সন্দেহ নিরাকরণার্থ সম্রাট জামশেদের একখানি চিত্র লইয়া পরম কৌতূহল এবং প্রেমানুরাগ-ফুল্ল-নয়নে আড়াল হইতে আকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিতেছেন। চিত্রে কুমারীর এক পার্শ্বে একটি নৃত্যশীল ময়ূর এবং অন্য পার্শ্বে একটি মনোরম মৃগ শোভা পাইতেছে। আর একখানি চিত্রে হম্মমখানার সুসজ্জিত নিভৃত কক্ষে প্রেম-উন্মাদিনী জোলেখা সুন্দরী পিপাসাতুর চিত্তে ইউসুফের নিকট প্রেম যাচঞা করিতেছেন-আর ধর্মপ্রাণ ইউসুফ ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পরমেশ্বরের ক্রোধের কথা জোলেখাকে জ্ঞাপন করিতেছেন। উভয়ের মুখে স্বর্গ ও নরকের চিত্র। একখানি চিত্রে মরুনির্বাসিতা হাজেরা বিবি শিশুপুত্র ইসমাইলকে শায়িত রাখিয়া জলের জন্য চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। এদিকে ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি হইতে এক নির্মল উৎসধারা বহির্গত হইতেছে। একজন স্বর্গীয় হুরী ইসমাইলের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহার চোখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। শিশু তাহার মুখপানে অনিমেষ আঁখিতে এমন সরল উদার অথচ কৌতূহলপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে যে, সমস্ত পৃথিবী যেন অমৃত ধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে! আর একখানি চিত্রে মহামতি সোলেমান তাঁহার রত্নখচিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সুন্দরীকুল-ললাম 'সাবা'র রাজ্ঞী বিলকিস রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া আগমন করতঃ কাঁচনির্মিত মেঝে সরোবর জ্ঞানে একটু বিচলিত হইয়া পার হইবার জন্য পরিধেয় বাস ঈষৎ টানিয়া ধরিয়াছেন। হজরত সোলেমান এবং অন্যান্য পারিষদমন্ডলী রাজ্ঞীর বুদ্ধিবিভ্রম দেখিয়া স্মিত হাস্য করিতেছেন। লজ্জার সহিত সৌন্দর্য ও অভিমান-গরিমা মিশিয়া রাজ্ঞী বিলকিসকে এক ভুবনমোহন সৌন্দর্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকারের অসংখ্য কবি-চিত্ত-বিনোদন তসবীরে চতুর্দিকের প্রাচীরগাত্রে বেহেশতের শোভা বিকাশ করিতেছে।

গৃহের মধ্যে আতর গোলাপের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। মেঝের উপর রাশি রাশি গোলাপ শোভা পাইতেছে। একপার্শ্বে বৃহৎ পালঙ্কের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার উপরে শ্বেত রেশমের মূল্যবান চাদরখানি দীপালোকে ঝলমল করিতেছে। তিন পার্শ্বে কিঙ্খাপের বহুমূল্যবান তাকিয়া। জরীর কার্য করা সবুজ মখমলে তাহা ঢাকা। বিছানার এক পার্শ্বে শাহনামা, সেকেন্দারনামা এবং কয়েকখানি বহুমূল্য ইতিহাস শোভা পাইতেছে। পুস্তকগুলি সমস্তই মণিখচিত করিয়া সুবর্ণের পুরু পাতে বাঁধা। মণিগুলি দীপালোকে ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে।

এই প্রকারের সুরম্য গৃহতলে বসিয়া একমনে ঈসা খাঁ কি চিন্তা করিতেছেন। ঈসা খাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী ফাতেমা অনেকক্ষণ হইল ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট



www.pathagar.com

দাঁড়াইয়া বহিগুলি নাড়াচাড়া করিতেছে, তবুও ঈসা খাঁর চমক নাই। ফাতেমা আর কখনও তাহার ভ্রাতার এই প্রকার অন্যমনস্কতা দেখে নাই। অন্যান্য দিবস ফাতেমা আসিতেই ঈসা খাঁ তাহাকে কত প্রকার প্রশ্ন করেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও গভীর ভালবাসা। প্রত্যেক দিন রাত্রেই ঈসা খাঁর পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের শান্তি ও প্রীতি সঞ্চারের জন্য ফাতেমাকে সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে হয়। ফাতেমা অতি সুন্দররূপে গাহিতে এবং বাজাইতে শিখিয়াছে। আহমদনগরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য করতলব খাঁ তিন বৎসর পর্যন্ত ফাতেমাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছেন। ফাতেমার ধর্ম ও শান্তি-রসাশ্রিত গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ফাতেমা যখন আঙ্গুলে মেজরাব পরিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে, তখন তারগুলি যেন আপনা আপনি কি এক যাদুবশে নাচিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অতৃপ্ত মদিরাবেশময় ঝঙ্কার দিতে থাকে। ফাতেমা এত দ্রুত অঙ্গুলি চালনায় অভ্যস্ত যে, মনে হয় তাহার অঙ্গুলি স্থির রহিয়াছে। সেতার আপনা আপনি বাজিতেছে। তারপর সেতারের ঝঙ্কার ও মধুবর্ষিণী মূর্চ্ছনার সহিত যখন তার সুধাকণ্ঠ গাহিয়া উঠে, তখন মনে হয় স্বর্গরাজ্য তরল হইয়া ধরাতলে বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ হইল ফাতেমা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভ্রাতার ইঙ্গিত না পাইলে সে কোনও দিন বসে না। বসে না যে, সে শুধু ঈসা খাঁর সুমধুর সম্ভাষণের জন্য-ঈসা খাঁ তাহাকে আদর করিয়া সস্নেহে বসিতে বলিবে বলিয়া। ফাতেমা যখন দেখিল যে, ঈসা খাঁ জানালার দিকে হইতে মুখ ফিরাইতেছেন না, তখন একখানি পুস্তকের দ্বারা আর একখানি পুস্তকে আঘাত করিল। আঘাতের শব্দে ঈসা খাঁর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের প্রান্ত-বদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চাহিলেন। দেখিলেন, সমস্ত ঘর ঝাড়ের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। আর সেই গৃহের কার্পেটমন্ডিত মেঝেতে দাঁড়াইয়া ফাতেমা ঈষৎ বঙ্কিম অবস্থায় তাঁহার শুভ্র শয্যার পার্শ্বে পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার অলকাবলী বিমুক্ত। তাহার বদনমন্ডল পুণ্যের জ্যোতিঃতে স্নিগ্ধ। দেখিয়া মনে হয় যে জ্যোৎস্নার রাজ্যে মূর্তিমতি বালিকা প্রতিমা শান্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। ফাতেমার বয়স সবে দ্বাদশ হইলেও এবং এখনও তাহার যৌবনপ্রাপ্তির বিলম্ব থাকিলেও তাহার মুখমন্ডল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ। সে ভাব অতি নির্মল-অতি পবিত্র-বুঝিবা স্বর্গরাজ্যের উর্ধের। ঈসা খাঁ মুখ তুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "কি গুল, কখন এসেছিস?" পাঠক জানিয়া রাখিবেন, ঈসা খাঁ আদর করিয়া ফাতেমাকে গুল অর্থাৎ ফুল বলিয়া ডাকিতেন।

ফাতেমাঃ হাঁ মিঞা ভাইজান! আপনি আজ একমনে কি ভাবছিলেন? আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

ঈসা খাঁঃ তা আমাকে ডাকিস নাই কেন? আমি না বল্লে কি বসতেও নেই?



www.pathagar.com

আকাশের দিকে চেয়ে মনটা যেন কোন্ দেশে চলে গিয়েছিল। তুই এইবার সেতার নিয়ে বসে যা। আজ খুব ভালো বাজাবি। মনটা বড় অস্থির।

ফাতেমা তখন সেতার লইয়া একখানি মখমলমণ্ডিত রূপার কুর্সীতে বসিয়া চম্পক বিনিন্দিত আঙ্গুলে মেজরাব পরিয়া সেতারের বক্ষ স্পর্শ করিল। সে ললিত-কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সেতারের সুপ্ত তন্ত্রী নাচিয়া উঠিয়া বাজিতে লাগিল। সেতারের মধুর ঝঙ্কারে আলোক-উজ্জ্বল গৃহ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝাড়ের কর্পূর-মিশ্রিত শত মোববাতি শুভ্রশিখা মৃদু কম্পনে কাঁপিতে লাগিল। সেতারের মনোমদ মধুর তরল ঝঙ্কারে ঈসা খাঁর এক আত্মীয় রমণী এবং আয়েশা খানম সাহেবা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহই এইরূপ হইত। ফাতেমার হাতে সেতার বাজিলে কেহই স্থির থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ ফাতেমার ধর্ম ও ঐশী প্রেম সম্পর্কীয় গজল শুনিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় আয়েশা খানম সেতার ঝঙ্কার দিলেই আসিতেন। ঈসা খাঁ আয়েশাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চরণ চুম্বন করিলেন এবং একখানি স্বর্ণ বিমণ্ডিত দ্বিরদ-রদ-রচিত বিচিত্র আসনে আম্মাজানকে বসিবার জন্য মখমলের মসনদ পাতিয়া দিলেন। আয়েশা খানম তাঁহার প্রীতিপ্রফুল্লতা-মণ্ডিত শান্ত অথচ গম্ভীর সৌন্দর্যে গৃহ আলোকিত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় আসন গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য রমণীরাও যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিলেন। সুবিশাল পুরী নীরব ও নিঃশব্দ। কেবল আসাদ-মঞ্জিলে (সিংহ-প্রাসাদে) সেতারের মধুর নিক্কণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চতুর্দিকে অমৃত-বৃষ্টি ঝরিতেছে। এক গৎ বাজাইবার পর ফাতেমা গজল ধরিল। সে পীযূষ-বর্ষিণী পারস্য ভাষায় গজলের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, পারস্য ভাষার অমৃতত্ব ও ছন্দ-ঝঙ্কার বঙ্গানুবাদে কেহ অনুসন্ধান করিবেন না।

সঙ্গীত

"হে শিব সুন্দর! চির মনোহর পরম পুরুষ পরাৎপর!
হে নিখিলশরণ ভুবনরঞ্জন পতিতপাবন ত্রিগুণাকর!
গগনে গগনে পবনে পবনে তোমারি মহিমা ভাসে,
কাননে কাননে কুসুমে কুসুমে তোমারি মাধুরী হাসে।
নদ নদী জল বহে কল কল ঢালিয়া অমিয় ধারা,
কুঞ্জ কাননে তোমার গায়নে বিহগ আপনা-হারা।
নীল আকাশে তারকা প্রকাশে তোমারি মহিমা রটে,
সবারি মাঝে তুমিই ফুটিছ তুমিই হাসিছ বটে!
(শুধু) আমারি হৃদয় রবে কি আঁধার? তাও কি কখনো হয়,
এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয়।"



www.pathagar.com

ফাতেমা ভাবাবেশে তন্ময় চিত্তে গগন-পবন সুধা-প্লাবিত করিয়া সঙ্গীতটি গাহিল। সে যখন শেষের চরণ ঝঙ্কার দিয়া নিমীলিত নেত্রে গাহিল, "এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয়," তখন তাহার মুখের দৃশ্যে এবং ভাবের আকুলতায় সকলেই কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বালিকা বিশ্রাম করিল। ঘরের ভিতর টানা-পাখা চলিলেও তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। পাখার বাতাসে তাহার মুক্ত অলকাবলী উড়িয়া দোল খাইতেছে। অথবা উহারা সঙ্গীতরসে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। বালিকা আবার গাহিল-

আজি, প্রভাতে-
বহিয়া কুসুম গন্ধ
সমীর বহিছে মন্দ
প্রাণের কুঞ্জে মুরজ মন্দ্রে
বাজিছে অযুত ছন্দ!

আজি, কার দরশন আশে
পুলকে হৃদয় ভাসে,
কার প্রেমের বাণী অমিয় ঢালিয়া
মরমে মরমে পশে!

কার ভুবনভুলান ছবি,
যেন প্রভাতের রবি
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে
দেখা দিয়ে যায় ডুবি।

কার অই বাঁশরি সুরে
পরাণ আকুল করে!
হৃদয়-কুঞ্জে কুসুমপুঞ্জে
কে ডাকিছে মোরে!

আমি চিনেছি ওরে এখন
ও যে জীবনের জীবন
হৃদয়ের ধন নয়নমণি
প্রাণবল্লভ রতন।



www.pathagar.com

ফাতেমা ৩০ মিনিটে তিনবার গাহিয়া এ সঙ্গীত শেষ করিল। শেষের পদ গাহিবার সময় ঐশী প্রেমের তীব্র উদাসে সকলের বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আয়েশা খানম বেএখতেয়ার হইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। ফাতেমা যখন গাহিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, কোটি স্বর্গ এই বালিকার পুণ্য চরণতলে চুরমার হইয়া যাইতেছে। সকলের মুখমন্ডল পুণ্যের মহিমায় কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! স্বর্গরাজ্যের এক অমৃত-ঝরণা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। আয়েশা খানম বলিলেন, "ফাতেমা! আর একটি ক্ষুদ্র মোনাজাত (প্রার্থনা) গেয়ে ক্ষান্ত হ'। বড় পরিশ্রম হচ্ছে।"

ফাতেমা বলিল, "না মা! কিছুই পরিশ্রম হয় নাই। আপনি যতক্ষণ বসবেন, আমি ততক্ষণ শুনাব।" বালিকার কণ্ঠে আবার বাজিল-

কুঞ্জ সাজিয়ে তোমারি আশে বসিয়ে আছি হে প্রাণধন।
তোমারি চরণ করিয়া শরণ সঁপিয়া দিয়েছি এ দেহ মন।
তোমারি তরে ভক্তি-কুসুমে গেঁথেছি আমি শোভন মালা,
হৃদি-সিংহাসনে বসহ বঁধুয়া আঁধার মানস করিয়ে আলা।
মরমে মরমে হৃদয়ে হৃদয়ে জেগেছে তোমার প্রেমের তৃষা,
(আমি) পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা।

ফাতেমা যখন কিন্নরীকণ্ঠে গাহিল, "আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা" তখন সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন।

ফাতেমা এমনি করিয়া সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা-জড়িত ব্যাকুল স্বরে এমন চমৎকার সুরে অপূর্ব ভঙ্গিমার সহিত "আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা" গাহিল যে, সকলে এক সঙ্গে ঐশী প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই প্রাণের ভিতরে সেই পরম সুন্দর পরম পুরুষের তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত থামিবার অর্ধঘন্টা পরে সকলের প্রেমোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইল। কিন্তু তখনও মনে হইতেছিল যেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সঙ্গীতের অমৃতায়মান স্বরে বোমবর্ত্তে স্থির ধীর হইয়া রহিয়াছে। ঈসা খাঁ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আম্মাজান! ফাতেমা কি চমৎকার গায়! আর আজকার সঙ্গীতের বাছাই বা কি মনোহর! ও যখন গায়, তখন আমার মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবী-কুলেশ্বরী জগৎজননী ফাতেমা জোহরা-ই মর্তে আসিয়া বালিকা মূর্তিতে গাহিতেছেন।"*

* জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও সঙ্গীতে পটু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি " কেতাবুল অঘানী"তে দ্রষ্টব্য। আরবে প্রাচীন কাল হইতেই নারীদিগের মধ্যে সঙ্গীত চর্চা প্রসার লাভ করিয়াছিল। ("এবনে খলদুন" দেখুন।)



www.pathagar.com

আয়েশাঃ আহা! আজ যদি তোমার কেবলা সাহেব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি কি আনন্দই না উপভোগ করিতেন! তবুও আমার বিশ্বাস, ও যখন গায়,
তখন তাঁর আত্মা এসে সঙ্গীত-সুধা পান করতে থাকে। ফাতেমা যতদিন আছে, ততদিন আমি এই স্বর্গসুখ অনুভব করছি। কিন্তু তারপর এ সুখ ও পুণ্য ভোগের ভাগ্য হবেনা।

ঈসাঃ কেন মা!

আয়েশাঃ কেন আর কি? ফাতেমাকে ত আর চিরকাল এখানে রাখতে পারব না। তুমিও ত বিবাহ করবে না যে, বৌমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারবো।

ফাতেমাঃ কেন মা! আমি চিরকালই আপনার কাছে থাকব।

আয়েশাঃ (হাস্য করিয়া) হাঁ বাছা! ঐ রকম সকলেই ভাবে বটে! কিন্তু এ জগতে যা ভাবা যায়, তাই ঠিক রাখতে পারা যায় না। তুমি তো মানুষ, সংসার-চক্রের এখনও কিছু জান না।

ফাতেমাঃ যা হ'ক মা, মিঞা ভাইয়ের শাদীর আয়োজন কর।

ঈসা খাঁ ফাতেমার কথায় লজ্জিত হইয়া জননীর অসাক্ষাতে মুঠি তুলিয়া স্মিতমুখে ইঙ্গিতে ফাতেমাকে বলিলেন, "চুপ"।

আয়েশাঃ হাঁ মা! আমি শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি!

ফাতেমাঃ হাঁ, আম্মাজান! কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী নাকি খুব সুন্দরী?

আয়েশাঃ থাকুক সুন্দরী, তাতে কি হবে?

ফাতেমাঃ কেন আম্মাজান?

আয়েশাঃ হিন্দুর মেয়ের আবার সৌন্দর্য!

ফাতেমাঃ না মা! সে নাকি পাঠানীর মত সুন্দরী!

আয়েশাঃ হাজার হউক, সে হিন্দুর মেয়ে।

ফাতেমাঃ সে ত আর হিন্দু থাকছে না, শাদী হলে সে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হবে।

আয়েশাঃ তা' হউক বাছা। তাই বলে আমি প্রতিমাপূজক কাফেরের কোনও কন্যাকে কদাপি ঘরে এনে বংশ কলুষিত করবো না।

ফাতেমাঃ কেন মা! আজকাল ত অনেক মুসলমানই হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করছে। হিন্দুর মেয়ে অসভ্য হলেও, মুসলমান-পরিবারে এসে আদব, কায়দা, লেহাজ, তমিজ, তাহজিব, আখলাক সমস্তই শিখে সভ্য হয়ে যায়।

আয়েশাঃ তা বটে মা! কিন্তু এতে গুরুতর জাতীয় অনিষ্ট হচ্ছে। হিন্দুর নিস্তেজ রক্ত মুসলমানের রক্তে মিশ্রিত হয়ে মুসলমানকে ক্রমশঃ হিন্দুর ন্যায় ভীরু, কাপুরুষ, ঐক্যবিহীন, জড়োপাসক, নির্বীর্য, নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।



www.pathagar.com

জননীর বাক্যে ঈসা খাঁর হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল। সহসা কুসুমমাল্য পরিধানোদ্যত ব্যক্তি মাল্যে সর্পের অবস্থিতি দর্শনে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, ঈসা খাঁ তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্বর্ণময়ীকে মানসপ্রতিমা সাজাইবার জন্য যে কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা জননী-মুখ হইতে নির্গত বাক্যের বজ্র নির্ঘাতে যেন চুরমার হইয়া গেল। ঈসা খাঁ একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "আম্মাজান! বাস্তবিকই হিন্দু কন্যার পাণিপীড়ন দোষে ভবিষ্যতে মুসলমানদিগকে অধঃপাতে যেতে হবে বলে মনে হয়।"*

আয়েশাঃ বাছা! এতে মুসলমানের এমন অধঃপতন হবে যে, কালে মুসলমান হিন্দুর ন্যায় কাপুরুষ ও "গোলামের জাতি"তে পরিণত হবে।

ঈসা খাঁঃ তবে কথাটা কেউ তলিয়ে দেখছে না কেন?

আয়েশাঃ দেখবে কে? স্বয়ং বাদশাহ আকবর পর্যন্ত এই পাপে লিপ্ত।

হিন্দুকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনিই এই প্রথা বিশেষরূপে প্রবর্তন করেছেন। তিনি ভাবছেন, এতে হিন্দুরা প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে বাধিত থাকবে। ফল কিন্তু বিপরীত ঘটবে। এতে স্পষ্টই ভারত-সম্রাটের সিংহাসনের উপর হিন্দুদের মাতুলত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর সাহস স্পর্ধা দিন দিন বেড়ে যাবে। ভাগিনেয় সম্রাট হলে হিন্দুদের উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ হয়ে উঠবে। এইরূপে দেশের রাজদন্ড পরিচালনায় হিন্দুর হস্তও নিযুক্ত হবে। অন্যদিকে বংশধরেরা মাতৃরক্তের হীনতাবশতঃ কাপুরুষ, বিলাসী এবং চরিত্রহীন হয়ে পড়বে। আমার মনে হয়, উত্তরকালে এ জন্য ভারতীয় মুসলমানকে বিশেষ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। এরা ভারতের রাজপতাকা স্বহস্তে রক্ষা করতে পারবে না।

ঈসা খাঁ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নীরব রহিলেন। জননীর হিন্দু-কন্যা বিবাহের অনিষ্টকারী মত বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি মনে মনে বিশেষ সঙ্কট গণিলেন।

ফাতেমাঃ আম্মাজান! তবে আমরা কখনো হিন্দু বউ আনবো না।

আয়েশাঃ কখনও না, ছিঃ!

এই বলিয়া আয়েশা খানম গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ফাতেমাও বাহির হইয়া গেল। ঈসা খাঁ একাকী বসিয়া ব্যথিতচিত্তে স্বর্ণময়ীর পত্রের কি উত্তর দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঈসা খাঁ অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত অনেক

---

* ভারত বিজয়ী মুসলমানেরা প্রায় সকলেই রাজপুতানী বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপর সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠবংশীয় হিন্দু কন্যার পাণিপীড়ন প্রথা খুবই প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে আমাদের মধ্যে নানা, নানী, দাদা, দাদী, মামু প্রভৃতি রাজপুত শব্দ ও হিন্দুয়ানী নানা প্রকারের প্রথা মেয়ে-মহলে এখনও বিরাজমান।



www.pathagar.com

ভাবিলেন–অনেক চিন্তা করিলেন; কিন্তু সে ভাবনা, সে চিন্তা অনন্ত সমুদ্র বক্ষে দিকহারা নৌকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। স্বর্ণময়ীর প্রেমপত্রখানি শত বারেরও অধিক পড়িলেন। যৌবনে বিদ্যুদ্দীপ্ত– সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়–আকাশে সৌদামিনীর মত চমকাইতে লাগিল! স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা স্মরণ করিয়া ঈসা খাঁ বড়ই কাতর ও মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, স্বর্ণকে তিনি প্রেমের বাহুতে জড়াইয়া না ধরিলে, স্বর্ণের জীবন ভস্মে পরিণত হইবে। রায়–নন্দিনীর পরিণাম ভাবিয়া তাহার হৃদয়খানি নিজের হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তিনি ব্যতীত স্বর্ণের আর কেহ নাই–কিছু নাই। তিনি ব্যতীত স্বর্ণ অনাথিনী, স্বর্ণ রাজকন্যা হইলেও তিনি ব্যতীত ভিখারিণী। ঈসা খাঁ শিহরিয়া উঠিলেন! বসিয়া, শুইয়া, দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন–কিন্তু সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। ঈসা খাঁ রায়–নন্দিনীকে যখন মন্দিরে দর্শন করিয়াছিলেন, যখন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন–তখনও স্বর্ণের সৌন্দর্য ও ভাষা তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। কিন্তু সে আনন্দ তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্বর্ণকে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিতেন–বারভূঁইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ মসনদ–ই–আলীকে, কেদার রায় যে পরম আগ্রহে কন্যাদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিতে কৃতার্থতা জ্ঞান করিবেন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; কিন্তু তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। প্রথমতঃ ঈসা খাঁ নিজের বিবাহ সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন না; তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহ করিলে কোন বীর্যবতী বীরাঙ্গনাকেই বিবাহ করিবেন! বীরাঙ্গনা বিবাহের খেয়াল ছিল বলিয়াই, স্বর্ণময়ীকে পরম রূপবতী এবং ফুটন্ত–যৌবনা দর্শন করিলেও কদাপি তাঁহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও তাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। কারণ, হিন্দু–কন্যাতে বীরত্বের আশা নিষবৃক্ষে আম্র ফলের আশা সদৃশ। এজন্য স্বর্ণময়ী তাঁহার নেত্রে গগন– শোভন চিত্ত–বিনোদন তারকার ন্যায় ফুটিয়াছিল, হাসিয়াছিল এবং কিরণ বিতরণও করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্ত–বিকার জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। তারার সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হয়। ছিঁড়িয়া গলে পরিবার কাহারও আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু স্বর্ণের প্রাণ দিয়া লেখা প্রাণ–ঢালা প্রেমের সৌন্দর্য–মাখা, আত্মোৎসর্গের অটল বিশ্বাস ও অচল নিষ্ঠাপূর্ণ পত্র পাঠে স্বর্ণময়ীর নাক্ষত্রিক সৌন্দর্য তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। তিনি যতই পুনঃ পুনঃ সেই হৃদয়ের লিপি পাঠ করিতে এবং নিজের হৃদয়–মুকুরে স্বর্ণের হৃদয়ের ছবি দেখিতে লাগিলেন, ততই স্বর্ণময়ী তাঁহার নিকট তারকার পরিবর্তে গোলাপে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে স্বর্ণ তাঁহার সম্মুখে মনপ্রাণ–প্রীণন, সুরভিপূর্ণ, শিশিরসিক্ত, ঊষালোক–প্রস্ফুটিত অতি মনোহর গরিমাপূর্ণ রক্তাভ লোভনীয় বসরাই গোলাপের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন তিনিও উহাকে আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হায়! ঠিক এমন সময়েই তাঁহার জননী উদ্যানের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, সামান্য বল প্রয়োগেই এদ্বার উন্মোচন করিতে পারিতেন। কিন্তু জননীর হিন্দু



www.pathagar.com

রমণী বিবাহের যুক্তিসঙ্গত অনিষ্টকারী মত লৌহ-অর্গলের মত সে-দ্বার কঠিনভাবে অবরুদ্ধ করিল। জননীর যুক্তির সারবত্তায় এবং বচনের ওজস্বিতায় ঈসা খাঁর উদ্দাম হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহ, হজরত দায়ুদের সঙ্গীত শ্রবণে উত্তাল তরঙ্গময়ী খরগতি স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ঈসা খাঁ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রায়-নন্দিনীর প্রেমের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাও যা, আর স্বর্ণময়ীর কোমল তরল প্রেমপূরিত-বক্ষে শাণিত বিষদগ্ধ ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া হৃৎপিন্ড খন্ড খন্ড করাও তাই। সুতরাং ঈসা খাঁ স্বর্ণের হৃদয়-দানের প্রত্যাখ্যানের কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার বীর-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হায়! জগতে সিংহ-শার্দুল-পরাক্রমী উচ্চন্ড-প্রতাপ নির্ভীক বীর-হৃদয়ও এমনি করিয়া প্রেমের নিকটে কুণ্ঠিত এবং লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। প্রেমের কি অপরাজেয় বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি! ক্ষুদ্র কীট হইতে বিশ্বস্রষ্টা অনন্তপুরুষ পর্যন্ত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রেমের শাসন কি কঠিন শাসন! প্রেমের আকর্ষণ কি মোহনীয়! আজি যুবতী-প্রেমের মদিরাকর্ষণে ঈসা খাঁর প্রশান্ত চিত্তও নিশাপতি সুধাংশুর কৌমুদী-আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে জননী-প্রেমের কঠিন শাসনে সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াও আকাংক্ষিত ক্ষেত্রে তরঙ্গ-বাহু বিস্তার করিতে পারিতেছে না। বেলাভূমি অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, উহা জননী-প্রেমের কঠিন ও অভঙ্গুর পর্বতপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ঈসা খাঁ অনেক গবেষণার পর বুঝিতে পারিলেন যে, জননীকে ধরিয়া বসিতে পারিলেই তাঁহার মত ফিরিবে। কিন্তু তজ্জন্য সুযোগ চাই। সুতরাং ঈসা খাঁ অবশেষে নিখিল-শরণ মঙ্গল-কারণ বিশ্ব-বিধাতার বিপদভঞ্জন চরণে আশ্রয় লইয়া চঞ্চলচিত্ত কতকটা স্থির করিলেন। তৎপর স্বর্ণখচিত 'খাস-কাগজে' কস্তুরী-গন্ধ-বাসিত স্বর্ণ-কালিতে স্বর্ণময়ীকে লিখিলেনঃ

প্রিয়তমে!

আমার অনন্ত স্নেহাশীর্বাদ, প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ এবং মঙ্গল-কামনা জানিবে। তোমার প্রাণ-ঢালা পত্র পাঠে তোমার হৃদয় করকমলবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। হে মানস সুন্দরী! বিশ্ব-প্রহ্লাদিনী পুষ্প-কুঞ্জ হৈম-কিরীটিনী উষা যেন তাহার গোলাপী করের বিচিত্র তুলিকায় অম্বরমন্ডল বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত জলদকদম্বে বিভূষিত এবং সমুজ্জল করে, তেমনি হে আমার হৃদয়-সরোবরের স্বর্ণ-সরোজিনি! তোমার নির্মল স্বর্গীয় প্রেমের বিশ্ব-বিনোদন-কিরণে এ হৃদয় সুশোভিত এবং পুলকিত হইয়াছে। তোমার বীণা-বাণী-নিন্দিত প্রেম-গুঞ্জরণে হৃদয়-কুসুম-যাহা মুকুলিত ছিল, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

প্রিয়তমা স্বর্ণময়ী!

অনেক দিন হইতেই তোমাকে স্বর্ণময়ী মূর্তির ন্যায় ভালোবাসিতাম। আজ সে স্বর্ণময়ী মূর্তি জীবন্ত ও সরস প্রেমময়ী, প্রীতিময়ী, হৃদয়ময়ী, কল্যাণময়ী, অমৃত প্রতিমায় পরিণত। সুতরাং সে মূর্তিকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে যে আনন্দ ও উল্লাস, তাহা কেবল অনুমেয়। আমি অযোগ্য হইলেও, তুমি যে হৃদয় দান করিয়াছ



www.pathagar.com

তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। অয়ি মনোরমে! যে হৃদয় শীতের তুষার সম্পাতে সঙ্কুচিত এবং আপনার মধ্যে আপনি লুক্কায়িত ছিল, তাহা আজ তোমার মৃত-সঞ্জীবনী প্রেম-মলয়া-স্পর্শে প্রসুনপুঞ্জ-মণ্ডিত, কোকিল-কূজন-কুহরিত, নবশষ্পদল শোভিত স্বর্গ-শ্রী-বিমণ্ডিত বাসন্তী-উদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

আয়ি হৃদয়ময়ী!

আজ হৃদয়ের প্রতি চক্ষু তোমার মোহিনী মূর্তি ধ্যানে নিমীলিত। প্রতি কর্ণ তোমার অমৃত-নিস্যন্দিনী জীবন-সঞ্চারিণী বাণী শ্রবণে উৎকর্ণ। প্রতি নাসারন্ধ্র তোমার কস্তুরী-বিনিন্দিত সুরভি গ্রহণে প্রমোদিত। প্রতি চরণ তোমার প্রেমের কুসুমাস্তৃত-পথে প্রধাবিত। প্রতি বাহুলতিকা তোমার প্রেমালিঙ্গনে প্রসারিত। প্রতি অণুপরমাণু তোমার দিকে উন্মুখ।

আয়ি কল্যাণি!

এক্ষণে কল্যাণময় প্রভু পরমেশ্বরের কল্যাণ-বারির জন্য প্রতীক্ষা কর। বসন্ত উপস্থিত হইলেই কল্যাণ-বারি বর্ষণ হয় না। বারি-বর্ষণের জন্য, কষ্টকর হইলেও কিঞ্চিৎ নিদাঘ-জ্বালা সহ্য করিতে হয়। হে সুন্দরি! নৌকা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও সজ্জিত হইলেই 'মরকত দ্বীপে' অভিযান করিতে পারে। অনুকূল বায়ু-প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হে মানসি! উপস্থিত তোমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলাম, প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা অভিনন্দন করিতে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। সে-বাধা করুণাময়ের আশীর্বাদে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করি। তজ্জন্য আমাদের অধীর বা নিরাশ হইবার কিছুই নাই। পিপাসা বাড়িতে থাকুক, শেষে উহা অমৃতপানে পরম তৃপ্তিলাভ করিবে।

সম্মুখে মোহররমোৎসব। তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

ইতি-

তোমারই

ঈসা

খিজিরপুর, আসাদ-মঞ্জিল।

পত্র শেষ করিয়া ঈসা খাঁ পুনরায় পত্রের এক কোণে বিশেষ করিয়া লিখিলেনঃ

"হে প্রেমময়ি! ব্যায়াম-চর্চা এবং অস্ত্র-সঞ্চালনে পটুতা লাভ করিতে বিশেষ যত্ন করিবে, ঐ পটুতাই সেই বাধা দূরীকরণে বিশেষ সহায় হইবে।"

অনন্তর পত্রখানি একটি বহুমূল্য আতরের শিশির সহিত ক্ষুদ্র রৌপ্যবাক্সে বন্ধ করিয়া রেশমী রুমালে বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিবনাথকে এক জোড়া উৎকৃষ্ট ধুতি, চাদর এবং একটি সুবর্ণ মুদ্রা বখ্‌শিশ দিলেন।



www.pathagar.com

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
## পরামর্শ

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য আজ খুব সকাল সকাল কাছারি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য মন্ত্রণা-গৃহে একখানি রৌপ্য-সিংহাসনে বসিয়াছেন। পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী শ্যামাকান্ত ও অন্যতম সেনাপতি কালিদাস ঢালী মখ্‌মল মন্ডিত উচ্চ ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবিষ্ট। দালানের দরজা বন্ধ। জানালাগুলি কেবল মুক্ত রহিয়াছে। দূরে ফটকের কাছে একজন পর্তুগীজ সিপাহী পাহারা দিতেছে।

তাহার উপর কড়া হুকুম, যেন রাজাদেশ ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মদ্যপানে রক্তবর্ণ। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ এবং অসুরের ন্যায় পেশীসম্পন্ন। চক্ষুর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী অথচ নির্মম। মুখমন্ডলে বীরত্বের তেজ নাই; কেবল ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান। চেহারায় লাবণ্যের পরিবর্তে তীব্র কামুকতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রতাপাদিত্যের বয়স ৫৫ বৎসর হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। একজন কবিরাজ দিবারাত্র তাঁহাকে কামাগ্নি-সন্দীপন রস, কামেশ্বর মোদক, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ইত্যাদি কামেন্দ্রিয়-উত্তেজক ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। প্রতাপাদিত্য যেমন কামুক, তেমনি নিষ্ঠুর। বঙ্গের সরস কোমল ভূমিতে তাঁহার ন্যায় মহাপাষন্ড, নৃশংস ও নর-পিশাচ অতীতে বিজয় সিংহ * রাজা কংসে এবং উত্তরকালে দেবী সিংহ ও নবকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতাপাদিত্য কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ "কমলাকান্ত। এতদিনে ত বসন্তখুড়োর নিপাত করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে নিয়ে এখনও ত কেউ ফিরল না।"

মন্ত্রীঃ মহারাজ! আপনি বসন্তপুরে গিয়েছিলেন বলে তত্ত্ব জানাবার সুবিধা হয়নি। স্বর্ণময়ীকে যারা লুটতে গিয়েছিল, তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রতাপঃ কি! অকৃতকার্য হয়ে ফিরল।

মন্ত্রীঃ আজ্ঞে হাঁ, অকৃতকার্য হয়ে।

প্রতাপঃ ডাকো তাদের।

---

* বিজয় সিংহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহল হইতে লিখিত পত্র দেখ। রাজা কংসের ভীষণ অত্যাচার "রিয়াজ-উস্-সালাতিনে" দেখ। দেবী সিংহ এবং রাজা নবকৃষ্ণের লোমহর্ষণ অত্যাচারের বিবরণের জন্য এডমন্ড বার্কের বক্তৃতা এবং "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী" দেখ।



www.pathagar.com

মন্ত্রী তখন তাহাদিগকে ডাকিবার জন্য সিপাহীদের ব্যারাকে লোক পাঠাইলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে রামদাস, রাধাকান্ত, হরি, শিবা, মাধা প্রভৃতি আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া প্রতাপকে দন্ডবৎ করিল। তৎপর দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রতাপঃ কেদার রায়ের কন্যা কোথায়?

রাধাকান্তঃ মহারাজ! তাকে ঈসা খাঁ ছিনিয়ে নিয়েছে।

প্রতাপঃ তোদের ঘাড়ে মাথা থাকতে?

রাধাঃ আমাদের অবশিষ্ট সকলেই মারা পড়েছে। আমাদের দোষ নেই। অপরাধ মার্জনাকরুন।

প্রতাপ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিল, "যা, এখনই তোদের একেবারে মার্জনা করছি।" এই বলিয়া জল্লাদের সর্দারকে আদেশ করিলেন, "এদের গায়ে আলকাতরা মেখে আগুনে পোড়াও।"

বলা বাহুল্য, পাঁচটি প্রাণী অর্ধ ঘন্টার মধ্যে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবী হইতে উড়িয়া গেল।

প্রতাপ ইহাদিগকে ভস্ম করিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু নিজের পৈশাচিক কামানলে আহুতি দিবার জন্য স্বর্ণময়ীর চিন্তায় চঞ্চল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, "মহারাজ! ব্যস্ত হবেন না। আগামী আষাঢ়ের মোহররম-উৎসব উপলক্ষে সৈন্য পাঠিয়ে স্বর্ণময়ীকে লুটে আনবার জোগাড় করছি।"

সেনাপতি কালিদাস ঢালী বলিল, "এই পরামর্শই ঠিক। মোহররম উপলক্ষে সাদুল্লাপুরে মহোৎসব হয়ে থাকে, নানা দেশ হতে লোক-সমাগম হয়। সেই সময় যাত্রীবেশে বহু সৈন্য প্রেরণ করতে পারব। একবার ধরে 'ময়ুরপঙ্খী'তে তুলতে পারলেই হয়। একশ' দাঁড়ের ময়ুরপঙ্খী কারও ধরবার সাধ্য হবে না।"

প্রতাপঃ কিন্তু কেদার রায় এক্ষণে খুব সাবধান হয়েছে। স্বর্ণময়ীকে রক্ষা করবার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত রক্ষী রাখবে। সাদুল্লাপুরের মিত্রদের লোক-জনের অভাব নাই।

শ্যামাঃ সেই যা একটু ভাবনা। প্রথমে একটা দাঙ্গা হবে।

প্রতাপঃ সে কি দাঙ্গা? সে যে দস্তুরমত যুদ্ধ বাধবে। এই ত চর-মুখে শুনলেম যে, সাদুল্লাপুরের মিত্র-বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর রক্ষাকল্পে দুইশ' সিপাহী কেদার রায় পাঠিয়েছেন।

কালিদাসঃ তা হোক। আমাদের মাহতাব খাঁ সেনাপতি সাহেব যদি যান, তাহলে আমরা দুইশত সিপাহী নিয়েও হাজার লোকের ভিতর হতে কেদার রায়ের কন্যাকে ছিনিয়ে আনতে পারবো।

প্রতাপঃ (একটু হাসিয়া) কেন, তুমি একাকী সাহস পাও না কি?

কালিঃ সাহস পাব না কেন, মহারাজ! কিন্তু জানেন ত, সাবধানের মার নেই। খাঁ



www.pathagar.com

সাহেব আমার চেয়ে সাহসী এবং কৌশলী। বিশেষতঃ সিপাহীরা তাঁর কথায় বিশেষ উৎসাহিত হয়। তিনি সঙ্গে থাকলে কার্য সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

প্রতাপঃ তবে তাঁকে ডাকান যাক।

কালিঃ আজ্ঞা হাঁ! তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করতে হচ্ছে।

প্রতাপাদিত্য তখনই সেনাপতি মাহতাব খাঁকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অর্ধ ঘন্টার মধ্যে খাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খাঁ সাহেবের বয়স ত্রিশের উপরে নহে। দেখিতে অত্যন্ত রূপবান ও তেজস্বী। চরিত্র অতি পবিত্র, মূর্তি গম্ভীর অথচ মনোহর। তাঁহার চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় এমন একটা আদব-কায়দা ও আত্মসম্মানের ভাব ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। প্রতাপাদিত্যের মত পাপিষ্ঠ প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রম করিতেন। প্রতাপ খাঁ সাহেবের সাহিত কদাপি কোনও কুপরামর্শ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতে পর্যন্ত সাহস পাইতেন না। তাঁহাকে দেখিলেই যেন লোকে সভ্য-ভব্য হইয়া পড়িত। অথচ তিনি অত্যন্ত মিতভাষী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের আহবান বা নিজের বিশেষ গরজ ব্যতীত খাঁ সাহেব কদাপি দরবারে আসিতেন না। ফল কথা, প্রতাপ ও খাঁ সাহেবের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ব্যবহার ছিল না। বিজাতির কাছে কেমন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চাকুরী করিতে হয়, খাঁ সাহেব তাহা ভালোরূপেই জানিতেন।

খাঁ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে কালিদাস সমস্ত কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলেন। খাঁ সাহেব বলিলেনঃ "পাত্রী কি মহারাজের প্রতি আসক্তা?

কালিঃ না, তাহলে কি আর এত গোলযোগ হয়? সেরূপ হলে ত অনায়াসেই কার্যসিদ্ধি হত। তাহলে আর আপনাকে ডাকবার আবশ্যক হত না।

খাঁঃ তবে ত এ কার্য বড়ই কলঙ্কের।

কালিঃ কোন্ পক্ষে?

খাঁঃ মহারাজের পক্ষে। তাকে জোর করে আনলে সে কি মাহরাজকে শাদী করবে?

কালিঃ জোর করে শাদী করাব। শাদী না করে বাঁদী করে রাখব।

খাঁঃ কাজটা বড়ই ঘৃণিত। এ কাপুরুষের কার্য।

প্রতাপের হৃদয় স্বর্ণময়ীর জন্য উন্মত্ত। সুতরাং খাঁ সাহেবের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় প্রবেশ করিল। আর কেহ হইলে হয়ত প্রতাপ তখনি মাথা কাটিবার আদেশ দিতেন। কিন্তু খাঁ সাহেব ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ বলিয়াই তাহা হইল না। তবুও প্রতাপ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেনঃ "খাঁ সাহেব! আপনাকে ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য ডাকা হয়নি।"



www.pathagar.com

ঃ আমিও তা বলছি না। কিন্তু কিসের জন্য ডেকেছেন মহারাজ?

প্রতাপঃ স্বর্ণময়ীকে এনে দিতে হবে।

খাঁঃ কেমন করে?

প্রতাপঃ লুট করে।

খাঁঃ মহারাজ! মাফ করুন, এমন কার্য ধর্ম সইবে না।

প্রতাপঃ আবার ধর্মের কথা?

খাঁঃ তবে কি ধর্ম পরিত্যাগ করব?

প্রতাপঃ প্রভুর আজ্ঞা পালনই ধর্ম।

খাঁঃ অধর্মজনক আজ্ঞাও কি?

প্রতাপঃ আজ্ঞা পালন দিয়ে কথা, তাতে আবার ধর্মাধর্ম কি?

খাঁঃ মহারাজ! তবে কি আপনি ধর্মাধর্ম মানেন না?

প্রতাপঃ প্রতাপাদিত্য অমন ধর্মের মুখে পদাঘাত করে।

খাঁঃ তওবা! তওবা!! এমন কথা বলবেন না, মহারাজ! সামান্য প্রভুত্ব পেয়ে আত্মহারা হবেন না। পরকাল আছে-বিচার আছে-জীবনের হিসাব-নিকাশ আছে-দীন্-দুনিয়ার বাদশাহ খোদাতাআলা নিত্যজাগ্রত। তিনি সবই দেখছেন।

প্রতাপঃ ওসব কোরান-কেতাবের কথা রেখে দিন। ওটা মুসলমানদেরই শ্রবণযোগ্য। আমি হিন্দু, ওসব মানি না।

খাঁঃ কেন, হিন্দুশাস্ত্রে কি কোরানের উপদেশ নেই?

প্রতাপাদিত্য বড়ই জ্বলিয়া গেলেন। তাঁহার ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। রাগিয়া বলিলেন, "ওসব শাস্ত্র দরিয়ায় ঢালো। আমার শাস্ত্র স্বর্ণময়ী, আমার ধর্ম স্বর্ণময়ী। আমি তাকেই চাই। যেমন করেই হোক তাকে এনে দিতে হবে।"

খাঁঃ মহারাজ! আমি মুসলমান, আমি বীরপুরুষ। তস্করের ন্যায় লুটে আনতে পারব না। ওটা দস্যুর কার্য। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষের পক্ষেই শোভা পায়।

প্রতাপঃ কিন্তু আমার অনুরোধে তা একবারের জন্য করতেই হবে।

খাঁঃ মহারাজ, অনুগতকে মাফ করবেন।

প্রতাপঃ খাঁ সাহেব! মার্জনা করবার সময় থাকলে, কখনই আপনাকে আহবান করতাম না। যেমন ক'রেই হোক স্বর্ণময়ীকে আনতেই হবে। বীরপুরুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক সময় দস্যু-তস্কর সাজতে হয়। তাতে কলঙ্ক নেই। খাঁ সাহেব! আপনি ত সামান্য সেনাপতি, অত বড় অবতার রাক্ষসবিধ্বংসী রামচন্দ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরপরাধ বালীকে তস্করের ন্যায় হত্যা করেছিলেন। তস্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎকে ছদ্মবেশে কাপুরুষের মত বধ করেছিলেন। বীরচূড়ামণি অর্জুন নপুংসক শিখন্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মকে পরাস্ত করেছিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে



www.pathagar.com

পরাস্ত করার জন্য "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" রূপ মিথ্যা কথা বলতে কুণ্ঠিত হননি। পুরাণে এরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে। স্বর্ণময়ীকে নিয়ে আসতে পারলে আমার প্রাণের দুহিতা অরুণাবতীকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করব। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা হবেন।

খাঁঃ মহারাজ! জোড় হস্তে মার্জনা প্রার্থনা করি। সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পেলেও এবং স্বর্গের অপ্সরীরা চরণ-সেবা করলেও মাহতাব খাঁ দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার নহে। অন্য যে পারে করুক।

প্রতাপঃ কি! এত বড় আস্পর্ধা? আমি বলছি তোমাকে এ কাজ করতেই হবে।

খাঁঃ মহারাজ! কখনই নয়। আপনার চাকরি পরিত্যাগ করলাম।

প্রতাপঃ সাবধান! ও জিহবা এখনই অগ্নিতে দগ্ধ করব, কার সাধ্য নিজ ইচ্ছায় আমার চাকরি পরিত্যাগ করে! তোমার মত খাঁকে শিক্ষা দিতে প্রতাপের এক নিমেষ সময়ের আবশ্যক।

খাঁঃ মাহরাজ! আমি আর আপনার ভৃত্য নহি। সুতরাং বিবেচনা করে কথা বলবেন।

প্রতাপাদিত্য এবার জ্বলিয়া উঠিলেন, পা হইতে পাদুকা খুলিয়া মাহতাব খাঁর দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। মাহতাব খাঁ শূন্য-পথেই পাদুকা লুফিয়া লইয়া "কমবখত বে-তমিজ শয়তান" বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে বিষম জোরে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া গেলেন। মাহতাব খাঁর পাদুকা-প্রহারে প্রতাপাদিত্যের নাক-মুখ হইতে দরদর ধারায় রক্ত ছুটিল। সকলে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় হাঁ হাঁ করিয়া খাঁ সাহেবের দিকে রুখিয়া উঠিল। প্রতাপাদিত্য "ছের উতার লাও, ছের উতার লাও" বলিয়া ক্রোধে গর্জিতে লাগিলেন। সেনাপতি সাহেব তখন ভীষণ গর্জনে আকাশ কাঁপাইয়া "কিছি কা মরণে কা এরাদা হ্যায় তো, আও" বলিয়া কোষ হইতে ঝন্‌ঝন্ শব্দে তরবারি আকর্ষণ করত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁ সাহেবের প্রদীপ্ত জ্বালাময়ী করালী-মূর্তি ও অগ্নি-জিহ্বা তরবারি দর্শনে সকলের বক্ষের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থামিয়া গেল। মাহতাব খাঁ ধীর-মন্থর গতিতে কৃপাণ-পাণি অবস্থায় ফিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই মুহূর্তেই যশোর ত্যাগ করিলেন।



www.pathagar.com

# সপ্তম পরিচ্ছেদ
## মনোহরপুরে

মাহতাব খাঁ রাগে ও ঘৃণায় যশোর নগর হইতে নৌকা ছাড়িলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যত শীঘ্র যশোরের এলাকার বাহিরে যাইতে পারেন, ততই মঙ্গল। যশোরের বায়ুমন্ডল যেন তাঁহার কাছে বিষাক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ প্রতাপদিত্যের লোকজন আসিয়া অনায়াসেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে। তিনি বীরপুরুষ হইলেও একাকী কি করিতে পারেন! তাঁহাকে ধরিতে পারিলে প্রতাপাদিত্য যে হাত-পা বাঁধিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি মাল্লাদিগকে খুব দ্রুত নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। খাঁ সাহেব যে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মাঝি-মাল্লারা অবশ্য তাহা জানিত না। তাহাদের জানিবার কথাও ছিল না। তাহারা জানিলে অবশ্য আসিত না। কারণ এইরূপ কার্যে প্রতাপাদিত্য যে তাহাদের শরীরের চর্ম ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ মাখিয়া দিবেন, তাহা তাহারা বেশ জানিত। সেনাপতি কোন দরকারবশতঃ মনোহরপুরে যাইতেছেন বলিয়া মাঝিরা বিশ্বাস করিতেছিল।

মাহতাব খাঁ মনোহরপুরে পঁহুছিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইল। মনোহরপুরে প্রতাপাদিত্যের একখানা বাড়ী ও একটি কাছারি ছিল। এতদ্ব্যতীত সেখানে গোলা ও হাটবাজার দস্তুরমত ছিল। কাছারিতে ১০ জন তবকী অর্থাৎ বন্দুকধারী, ২৫ জন লাঠিয়াল, একজন জমাদার, একজন নায়েব এবং অন্যান্য কর্মচারী ১০/১২ জন ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্ত্রীর সংখ্যা চল্লিশেরও উপর ছিল। এতদ্ব্যতীত উপপত্নীও যথেষ্ট ছিল। মনোহরপুরে চতুর্থ রাণী দুর্গাবতী বাস করিতেছেন। তিনি পূর্বে যশোরের প্রাসাদের অধিবাসিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে সন্তানাদি হওয়ায় তাঁহার যৌবনে ভাঁটা ধরিলে প্রতাপাদিত্যের মন-মধুকর যখন দুর্গাবতীকে কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া মনে করিল, তখন মনোহরপুরের ক্ষুদ্র বাটীতে তাঁহাকে সরাইবার ব্যবস্থা হইল। তদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য আরও একটি কারণে দুর্গাবতীকে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্গাবতী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন, একবার রাগিয়া গেলে তাঁহার জিহবার বাক্যানলে সকলকেই দগ্ধ হইতে হইত। তাঁহার জিহবা সর্বতোভাবে নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচ ছিল। তাঁহার তীব্র সমালোচনা এবং বিদ্রূপ-বাণে প্রাসাদবাসিনী অন্যান্য রাণীরা অস্থির থাকিতেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকেও অতি সামান্যই গ্রাহ্য করিতেন। দুর্গাবতী তাঁহার পরবর্তী রাণীদিগকে আপনার ক্রীতদাসী অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন। প্রতাপাদিত্য অবশেষে এই দারুণ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে মনোহরপুরে নির্বাসিত



www.pathagar.com

করিয়াছিলেন।

দুর্গাবতী মনোহরপুর আসিয়া প্রাসাদের নিত্য ব্যভিচার, অত্যাচার ও হত্যা-দূষিত বিষাক্ত বায়ু হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য বৎসরের কোনও সময় এদিকে আসিলে দুর্গাবতীর মন্দিরে অবশ্যই পদধূলি পড়িত। নতুবা তাহাকে এক প্রকার বৈধব্য জীবনই কাটাইতে হইত। এই দুর্গাবতীর সময়েই মাহতাব খাঁ যশোরের রাজপুরীতে প্রবেশ এবং নিজের বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা। যশোরের অন্তঃপুরে তখন দুর্গাবতীর একাধিপত্য। দুর্গাবতীর যৌবনের সুবর্ণ-শৃঙ্খলে প্রতাপাদিত্য তখন দুশ্ছেদ্যভাবে পোষ্য কুকুরের ন্যায় বাঁধা ছিলেন। দুর্তাবতী মুখরা ও আধিপত্যপ্রিয়া হইলেও অত্যন্ত বদান্যা ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। লোকের গুণানুকীর্তনে সর্বদাই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠ দেখা যাইত। প্রতাপের কুৎসিত ব্যবহারই পরে তাঁহাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছিল। মাহতাব খাঁ রাণীর সৌভাগ্যের দিনে রাণীর হস্ত ও মুখ হইতে অনেক আর্থিক পুরস্কার ও বাচনিক প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়া রাণীকে তিনি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। রাণীও মাহতাবকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রাণীর মনোহরপুর নির্বাসনে এবং তাঁহার আধিপত্যচ্যুতিতে সর্বাপেক্ষা যদি কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে সে মাহতাব খাঁ। রাণীর একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, নাম অরুণাবতী। পুত্র শিশু, পঞ্চম বৎসর মাত্র বয়ক্রম। নাম অরুণকুমার। অরুণাবতী পূর্ণ যুবতী। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গ, কূলে কূলে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। বক্ষে বক্ষে প্রেমের তরঙ্গ আকুল উচ্ছ্বাসে আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। চোখে-মুখে প্রেমের বিদ্যুদ্দীপ্তি স্ফুরিত হইতেছে। প্রাণের পিপাসা বাড়িতে বাড়িতে এখন যেন উহা বিশ্ব-বিমোহিণী মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। সুপক্ব আঙ্গুর বা রসাল আম্র যেমন বৃক্ষ-পক্ব হইলে ফাট্ ফাট্ হইয়া পড়ে, অরুণাবতীও তেমনি রসবতী হইয়া ফাট্ ফাট্ প্রায়। তাহার হৃষ্ট-পুষ্ট সবল ও সুডৌল দেহে যৌবন পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, রমণী বহুকষ্টে বহু সাধনায় যৌবনের প্রতাপ ও প্রভাব আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যেন চন্দ্রমার সুবর্ণ কৌমুদীজাল বিস্নাত ভাদ্রের সফেন তোয়া স্রোতস্বতী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া হেলিয়া-দুলিয়া আবর্ত রচিয়া কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এত বয়স এবং এত রূপের গৌরব থাকা সত্ত্বেও অরুণাবতীর বিবাহ হয় নাই। বিবাহ না হইবার কারণ পাত্র না জোটা। পাত্র না জুটিবার কারণ প্রতাপাদিত্যের নিদারুণ নৃশংস পৈশাচিক ব্যবহার। কথাটা একটু খুলিয়াই বলিতেছি। ইতঃপূর্বে প্রতাপ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিভাবতীর বিবাহ বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রতাপের নিদ্রাকর্ষণ হইত না। কিন্তু



www.pathagar.com

রামচন্দ্র রায় জীবিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য অধিকার করা অসম্ভব। যুদ্ধ করিলে প্রতাপই জিতিবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? রামচন্দ্র রায় বারভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই পন্টনে পর্তুগীজ ও ওলান্দাজ একদল উৎকৃষ্ট গোলান্দাজ সেনা ছিল। তাহাদের তোপের জন্য প্রতাপাদিত্য ভীত ছিলেন। অগত্যা প্রতাপাদিত্য জামাতাকে কোন পর্ব উপলক্ষে বিশেষ সমাদর ও ধুম-ধামের সহিত একদা নিমন্ত্রণ করিলেন। রামচন্দ্র রায় শ্বশুরের নিমন্ত্রণ পাইয়া পরমাহলাদে যশোরের রাজপুরীতে আগমন করিলেন। প্রতাপাদিত্য গভীর নিশীথকালে জামাতা রামচন্দ্র রায়কে উপাংশু-বধ করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। নরাধম পাষণ্ড একবারের জন্যও উদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চিন্তা করিলেন না। কন্যা সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ ঘটনার আভাস পাইয়া স্বামীকে সমস্ত নিবেদন করিল। রামচন্দ্র রায় রাত্রিযোগে কৌশলক্রমে প্রতাপাদিত্যের পুরী হইতে প্রাণ লইয়া কোনরূপে পলায়ন করিলেন।* এই ঘটনার পরে কোনও রাজা কি জমিদার প্রতাপাদিত্যের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চাহিতেন না। এ-দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহই সাহস করিয়া সুন্দরবনের ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় নররক্ত-লোলুপ প্রতাপের কন্যা বিবাহের প্রস্তাব করিবারও সাহস করিত না। প্রতাপও গর্ব-অহংকারে রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদানের কল্পনাও করিতেন না। কিন্তু এ দিকে কন্যার দেহে যখন যৌবন-জোয়ার খরতর বেগে বহিতে লাগিল, তখন প্রতাপাদিত্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাহতাব খাঁর করে অরুণাবতীকে সমর্পণের বাসনা করিলেন। কারণ মাহতাব খাঁ অপেক্ষা উচ্চদরের পাত্র আর জুটিতেছিল না। কিন্তু মাহতাব খাঁকে সাধিয়া কন্যা দান করিতে প্রতাপের ইচ্ছা ছিল না। কোনও ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিলেন। ঘটনাও জুটিয়া উঠিল। পাঠকগণ পূর্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতাপের দুর্ভাগ্যবশতঃ খাঁ সাহেব স্বর্ণময়ী-হরণে সম্মত হইলেন না।

সে যাহা হউক, মাহতাব খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে পথে মনোহরপুরে অবতরণ করিয়া মাতৃতুল্য রাণী দুর্গাবতীর আশীর্বাদ লইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। অরুণাবতীকে তিনি ভালোবাসিতেন, কিন্তু সে ভালোবাসায় প্রেমের নেশা প্রবেশ করে নাই। খাঁ সাহেব ঘাটে নৌকা লাগাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে চিনিত ও জানিত। রাণী দুর্গাবতী মাহতাব খাঁকে দেখিয়া আনন্দে পরম পুলকিত হইলেন। অতি শীঘ্র সমাদরে বসাইয়া অরুণাবতীকে জলযোগের যোগাড় করিতে বলিলেন। মাহতাব খাঁ জলযোগের আয়োজন দেখিয়া রাণীকে বলিলেন, "মা! আমার জলযোগের সময় নেই। আমাকে

---

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বৌঠাকুরাণীর হাট" দেখ।



www.pathagar.com

এখনই মহারাজের এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। যদি বেঁচে থাকি এবং খোদার মর্জী সুদিন পাই, তখন আবার শ্রীচরণে উপস্থিত হব।" এই বলিয়া রাজার সমস্ত ব্যবহার দুঃখার্ত চিত্তে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রাণীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। ঘটনা শুনিয়া এবং প্রতাপের ক্রোধের কথা ভাবিয়া দুর্গাবতীর প্রাণ যেন শুকাইয়া গেল। রাণী সত্য সত্যই মাহতাব খাঁকে পুত্রের ন্যায় ভালোবাসিতেন। তারপর অরুণাবতীর বিবাহের আশাভরসাও যে মাহতাব খাঁর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিশাইবে, ইহা ভাবিয়া রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। বুকের পঞ্জর যেন ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল! রাণী ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না! এদিকে মাহতাব খাঁর সম্মুখে কাঁদিতেও পারিতেছিলেন না। এরূপ অনেকেই থাকে, যারা অতীব তীব্র সন্তাপেও লোকের সম্মুখে কাঁদিতে পারে না। রাণীও সেই প্রকৃতির ছিলেন। তিনি উঠিয়া অন্য ঘরে গেলেন। সেই নির্জন গৃহে যাইয়া তাঁহার রুদ্ধপ্রাণের উচ্ছ্বাস একেবারে গুমরিয়া উঠিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। বাস্তবিক রাণী যুগপৎ পুত্র-শোক ও কন্যা-শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অরুণাবতী নানা প্রকার মিষ্টান্ন এবং ফলমূলে স্বর্ণথালা ও রৌপ্যবাটি সাজাইয়া মাহতাব খাঁর সম্মুখে উপস্থিত করিল। মাহতাব খাঁ প্রায় দুই বৎসর পরে অরুণাবতীকে দেখিলেন। দেখিয়া একেবারে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। খাঁ সাহেব যেন সহসা এক স্বপ্নাতীত রাজ্যে উপনীত হইলেন; তিনি দেখিলেন, অরুণাবতীর সর্বাঙ্গ আশাতীতরূপে পরিপুষ্ট। সমস্ত শরীরে যৌবন উথলিয়া পড়িতেছে। কৃতজ্ঞতার ডাগর আঁখিতটে শত শত বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। দেহলতিকা, জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীগন্ধার ন্যায় ফুটিয়া গর্বভরে বৃন্তের উপর ঈষৎ হেলিত অবস্থায় যেন দন্ডায়মানা। অরুণাবতী যদিও পূর্বে শত শতবার মাহতাব খাঁকে দেখিয়াছে, তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়াছে, তাঁহার সহিত কতদিন নদীতটে ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আজ সে মাহতাব খাঁকে যেমন অপূর্ব সুন্দর সুঠাম রমণীয় কান্তি লোভনীয় পুরুষরূপে দেখিতেছে, পূর্বে সে কখনও তেমনটি দেখে নাই। মাহতাব খাঁই যে তাহার প্রেম-দেবতা হইবেন, তাহার পাণিতেই যে পাণি মিশাইতে হইবে, অরুণাবতী তাহা নানা সূত্রেই বেশ ভাল করিয়া শুনিয়াছিল এবং সেই সূত্রে অরুণাবতীর হৃদয় মাহতাব খাঁর অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলে। অরুণাবতী যখন সেই পরিপূর্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে মাহতাব খাঁকে দেখিতেছিলেন, তখন খাঁ সাহেব যে তাহার চক্ষে অদ্বিতীয় পুরুষরত্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রেম যখন অসুন্দরকে সুন্দর করে-মরুকে উদ্যানে পরিণত করে-অগ্নিকে তুষার, -নীরসকে সরস এবং অপবিত্রকে পবিত্র করে, তখন স্বাভাবিক সুন্দর খাঁ সাহেব যে অপার্থিব সুন্দর বলিয়া অরুণাবতীর চক্ষে প্রতিভাত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? উষার দৃষ্টি যেমন আকাশকে অরুণিমাজালে বিভূষিত করে-বসন্ত যেমন বিগতশ্রী উদ্যানকে স্বর্গীয়



www.pathagar.com

শ্রীমন্ডিত ফুল্লফুলদলে বিশোভিত করে, রজনী যেমন আঁধার আকাশে তারকামালা ফুটাইয়া অপার্থিব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে- প্রেমও তেমনি পেমাস্পদকে অলৌকিক সৌন্দর্য, অসাধারণ গুণ এবং অপার্থিব মহিমায় বিভূষিত, বিমন্ডিত এবং বিশোভিত করে। মাহতাব খাঁ খাইতে খাইতে এক একবার অরুণাবতীর দিকে চাহিতেছেন, অরুণাবতী তাহার ত্রিভুবন-মোহিনী দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইতেছে। লজ্জা-রাগে তাহার বদনমন্ডল আরক্ত হইয়া যাইতেছে। আবার মাহতাব খাঁ নত আঁখিতে আহারে রত হওয়া মাত্রই, অরুণাবতীর চঞ্চল ও পিপাসাতুর আঁখি তাহার মুখে দৃষ্টি স্থাপন করিতেছে। আবার আঁখিতে আঁখিতে পড়া মাত্রই দৃষ্টি অন্য বিষয়ে পতিত হইতেছে এবং হৃদয় ফুলিতেছে, শরীর শিহরিত হইতেছে, মন দুলিতেছে। প্রাণের তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ উভয়ের হৃদয়কে এত জোরে টানিতেছে যে, বোধ হয় উভয়ের হৃদয় দুইটি শরীর ভেদ করিয়া এই মুহূর্তেই বাহির হইয়া আসিবে। সেনাপতি নিজের সঙ্কটজনক অবস্থা ভাবিয়া বীরের মত আত্মসংযম করিবার চেষ্টা করিলেন। অতি সামান্য নাশতা করিয়াই হাত ধুইতে উদ্যত হইলে, অরুণাবতী লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে কি!" এই বলিয়া মাহতাব খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "সব খেতে হবে।" যুবতীর স্নেহমাখা সুকোমল করস্পর্শে মাহতাব খাঁর সর্বাঙ্গে যেন কি এক অপার্থিব পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়ের প্রত্যেক বিন্দু সুধাধারায় সিক্ত হইল। মাহতাব খাঁ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছলছল নেত্রে তাঁহার বিপদের কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া যুবতীর বুক অতি বিষম বেগে স্পন্দিত হইয়া থামিয়া গেল। যুবতী বাক্‌শূন্য স্পন্দনহীন মৃন্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দন্ডায়মান। অরুণাবতীর দুই চক্ষে অশ্রুর ঝরণা ছুটিল। প্রতাপ-কুমারীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে একবার ছিন্ন লতিকার ন্যায় মাহতাব খাঁর চরণমূলে পতিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহাতে বাধ সাধিল। যুবতী অবশেষে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাছে বা পড়িয়া যায় এই ভাবিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুত উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন। প্রিয়তমের উভয় বাহুস্পর্শে যুবতীর শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে যে প্রেমের তীব্র উচ্ছ্বাস হইল, তাহাতে যুবতী ক্ষণকালের জন্য আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ তাহাকে মূর্ছিত মনে করিয়া তাহার মস্তক নিজ ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক পাখা দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব মহাবিপদ গণিয়া দুর্গাবতীতে ব্যস্তকণ্ঠে ৩/৪ বার "রাণী মা। রাণী মা।" বলিয়া আহবান করিতেই রাণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। চোখে-মুখে কয়েকবার শীতল জলের ঝাপটা দিলে অরুণাবতীর চেতনা হইল। সে আপনাকে তদবস্থায় দেখিয়া লজ্জায় সমস্ত বদনমন্ডল আরক্ত করিয়া অবগুন্ঠন টানিয়া দূরে সরিয়া বসিল। রাণী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ইহা যে মূর্ছা নহে, নিদারুণ সকাম প্রেমাবেশ,



www.pathagar.com

তাহা বুঝিয়া কন্যার মানসিক অবস্থার শোচনীয়তা স্মরণে নিতান্তই ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরস্পরের চুম্বনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে।

রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মাহতাব খাঁ দুর্গাবতীর নিকট নিতান্ত বিনীত ও কাতরভাবে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা! আশীর্বাদ করি নিরাপদ দীর্ঘজীবন লাভ কর। এ রাক্ষসের রাজ্য ছেড়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বাবা! আমার অরুণাবতীর কি উপায় হবে?" রাণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। মাহতাব খাঁর প্রাণেও অসীম বেদনা। সে স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহার পা যেন অগ্রসর হইতেছিল না। তাঁহার হৃদয় ও চক্ষু সমস্তই অরুণাবতীতে ডুবিয়া মজিয়া গিয়াছিল। বহু কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিয়া স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণীর কথায় হৃদয় যেন সেখানেই বসিয়া পড়িল। মনে হইল, অরুণাবতীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইব না, যা' হইবার তা' হউক। আবার ভাবিলেন, এখানে থাকিবই বা কোথায়? আমার জন্য অরুণাবতীও শেষে কি প্রতাপের রোষানলে দগ্ধ হইবে! মাহতাব খাঁ বজ্রাহতের ন্যায় বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি এমন দুর্বলতা জীবনে কখনও উপলব্ধি করেন নাই। আজ তিনি দেখিলেন, হৃদয় প্রেম-সুরায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে প্রশান্ত করা ভীষণ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষাও শত কঠিন।

"অরুণাবতীর কি উপায় হবে?" এ-প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন? তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপে প্রায় অর্ধ ঘন্টা অতীত হইল, এমন সময় দূর আকাশের কোণে গুড়গুড় করিয়া মেঘ ডাকায় মাহতাব খাঁর চটকা ভাঙ্গিল। বহু কষ্ট ও যত্নে হৃদয় বাঁধিয়া তিনি বলিলেন, "মা! আমি জীবনে কখনও অরুণাবতীকে ভুলব না। সুদিন হ'লে অরুণাকে বিয়ে করব। অরুণা ব্যতীত কা'কেও বিয়ে করব না। মা! আমি এখন পথের কাঙ্গাল। সঙ্গে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা আছে। ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে জানি না। মা! আমি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি এখন এলাহাবাদের বাদশাহী দুর্গের অধ্যক্ষ। আমি দশ বৎসর চাকুরী করে যে-অর্থ সঞ্চিত করেছি, তা' সবই মহারাজের নিকট গচ্ছিত। সে বিপুল অর্থ পেলে আমি অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা যা' ঘটেছে, তা'তে অতি শীঘ্র রাজ্য ছাড়তে না পারলে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হবে। হয়ত এতক্ষণ আমাকে ধরবার জন্য রণতরী অর্ধপথে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

রাণী মাহতাব খাঁর অর্থাভাবে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাড়াতাড়ি একশত মোহরের একটি মোড়ক এবং নিজের হস্তের একটি হীরকাঙ্গুরী উন্মোচনপূর্বক মাহতাব খাঁর করে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আর বিলম্ব করো না। সত্বর প্রস্থান কর। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তাঁর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করলাম। বড় বিপদ!



www.pathagar.com

সত্বর প্রস্থান কর।" রাণীকে অভিবাদনপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ঘাটে যাইয়া তাড়াতাড়ি নৌকা খুলিয়া দিলে মাল্লারা দ্রুত দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

"বাবা! আমার অরুণাবতীর কি হবে?" রাণী দুর্গাবতীর এ কথায় অরুণাবতীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে নিজের হৃদয়কে বহু প্রবোধিত করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা প্রবোধিত হইল না। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার মন ঘড়ির ন্যায় টক্‌টক্ করিয়া তাহাকে বলিল, "মাহতাব খাঁ আর এ রাজ্যে ফিরিবে না, ফিরিতে পারে না। তোমার কপাল চিরদিনের জন্য পুড়ে গেল।"

অরুণাবতী গৃহে আসিয়া বাত্যাহত লতিকার ন্যায় উত্তপ্ত সৈকত–নিক্ষিপ্ত শফরীর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মাহতাব খাঁকে যতই ভুলিতে চেষ্টা করিল, ততই তাহার পক্ষে মাহতাব খাঁর বিরহ অসহ্য হইতে অসহ্যতম হইয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে অরুণাবতী উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার গহনার হস্তিদন্ত নির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকা লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাটীর পশ্চাৎভাগের খিড়কী–দ্বার উদঘাটনপূর্বক প্রেমাস্পদের উদ্দেশে ধাবিত হইল।

নৌকা তখন ঘাট ছাড়িয়া কয়েক রশি দূরে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাতি দেখা যাইতেছে। নদীতীর নির্জন। অরুণাবতী বহুদিন নদীতটে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সে তাহার গন্তব্যপথে রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত ধাবিত হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যে নৌকার নিকটবর্তী হইয়া নৌকা কূলে ভিড়াইতে বলিল। মাহতাব খাঁ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অরুণাবতীকে গৃহে ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিনীত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মাঝিরা নৌকা কূলে ভিড়াইতেছিল, কিন্তু মাহতাব খাঁর নিষেধে পুনরায় ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল। অরুণাবতী তখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া নৌকা ধরিতে অগ্রসর হইল। মাহতাব খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অরুণাবতীকে মুহূর্ত মধ্যে কিসতীতে টানিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, অরুণাবতী জলে পড়ার কোন কষ্ট পায় নাই। কারণ, প্রত্যহ সে নদীর জলে স্নান করিত বলিয়া ভাল সাঁতার জানিত। উভয়ের সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তন করা আবশ্যক হইল। অরুণাবতী আসিবার কালে কেবল গহনার বাক্সই আনিয়াছিল। অতিরিক্ত কাপড় আনিবার বিষয় চিন্তাও করে নাই। মাহতাব খাঁও ধুতি পরিতেন না। সুতরাং সিক্ত শাড়ী পরিবর্তন করিয়া অরুণা কি পরিবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। এদিকে অরুণাবতী পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নির্গত হইবা মাত্রই দ্বারের শব্দে রাণী গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি বাহির হইয়াই তরল আঁধারে বেশ দেখিলেন যে, অরুণাবতী গহনার বাক্স হস্তে নৌকার উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তিনি কন্যার



www.pathagar.com

ভীষণ প্রেমোন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া তাহার জীবন সম্বন্ধে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাণী তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া নিজের কিছু গহনা, দুইশত মোহর এবং কয়েকখানি কাপড় লইয়া অরুণাবতীর পশ্চাতে ছুটিলেন। তিনি পৌঁছিতে পৌঁছিতেই মাহতাব খাঁ সুন্দরীকে জল হইতে নৌকায় তুলিলেন এবং অরুণার বস্ত্র পরিবর্তনের মহাসমস্যায় পতিত হইয়া অবশেষে বাক্স হইতে নিজের অপ্রশস্ত রেশমী পাগড়ী বাহির করিয়া তাহাকে পরিধানের জন্য দিতেছিলেন, ঠিক এমন সময়েই রাণী তট হইতে আহ্বান করিলেন। দুর্গাবতীর আহ্বানে অরুণার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মাহতাব খাঁও লজ্জিত হইলেন। রাণী নৌকা লাগাইতে বলায় অরুণার ভয় হইল, পাছে বা তাহাকে ছিনাইয়া বাটি লইয়া যায়। অরুণা বলিল, "মা। নৌকা আর লাগাব না, আমি যখন ভেসেছি, তখন ভাসতে দাও।" রাণী অরুণার প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া বলিলেন, "মা, তুই কলঙ্কিনী নস। তুই-ই প্রকৃত সতী। মা। আমি তোর গমনে বাধা দিব না। আমি গমনের সুবিধা করে দিবার জন্যই এসেছি। কাপড় ও টাকা এনেছি, নিয়া যা।"

নৌকা কূলে লাগিল। রাণী মোহর, গহনা ও কাপড় দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমাদেরকে অকূলে ভাসালাম, কিন্তু বিধাতা শীঘ্রই তোমাদেরকে কূল দিবেন।" রাণী এই বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রাণী বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে এক একবার সাশ্রুনেত্রে পশ্চাৎ ফিরিয়া নৌকা দেখিতে লাগিলেন। শেষে আর নৌকা দেখা গেল না। কেবল প্রদীপের আলো দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে নৌকা বাঁক ফিরিলে তাহাও অন্তর্হিত হইল। রাণী নিঃশব্দে বাটি ফিরিলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া বুঝিলেন-বাড়ী যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। প্রকৃতি যেন উদাস প্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। রাণী রুদ্ধশ্বাসে গৃহে প্রবেশ করতঃ বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।



www.pathagar.com

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## হেমদার ষড়যন্ত্র

মোহররম নিকটবর্তী। আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমদাকান্ত কাশী হইতে বাটি ফিরিয়াছে। তাহার এক পিসী বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। পিসী হেমদাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিয়াছিলেন। পিসীর সন্তানাদি কিছুই ছিল না। হেমদাই তাঁহার সর্বস্ব। পিসীর যথেষ্ট টাকা-কড়ি ছিল। সুতরাং হেমদাকান্ত বাল্যকাল হইতেই পিসী ক্ষীরদার আদরে বিলাসে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ছোটবেলা হইতেই তাহার কোনও আব্দার বা আকাংক্ষা একদিনের জন্যও অপূর্ণ থাকিত না। হেমদা তাহার পিসী ক্ষীরদার নিকটেই প্রায় থাকিত। কাশীতে গঙ্গাতটে একটি দ্বিতল বাড়ীতে হেমদা তাহার পিসী ও স্ত্রীর সহিত বাস করিত। পিসীর নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিল। সে কালের এই পঁচিশ হাজার আজকালকার লাখেরও উপর। পিসী সমস্ত টাকাই লগ্নী কারবারে লাগাইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে আয় হইত তাহাতেই পিসী, হেমদা ও হেমদা-পত্নী কমলার স্বচ্ছন্দে খরচপত্র পোষাইত। টাকা হেমদার হস্তেই খাটিত। পিসী দিবারাত্র তপ-জপ আহ্নিক উপবাস করিয়া এবং নানা প্রকার দেবলীলা ও উৎসব দেখিয়া সময় কাটাইতেন। ক্ষীরদা-সুন্দরী সম্ভ্রান্ত হিন্দু-ঘরের আদর্শ নিষ্ঠাবতী প্রবীণা মহিলার ন্যায় ছিলেন। জীবন-সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীরদাও ততই অন্তিমের সম্বলের জন্য অধীর ও আকুল প্রাণে ধর্মকর্মেই অধিকতর লিপ্ত হইতে লাগিলেন। সংসারের সর্বস্বই হেমদা ও তাহার স্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। হেমদা কয়েক বৎসরের মধ্যেই টাকা খাটাইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোক হইয়া দাঁড়াইল। সে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে কাশীর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ধনীতে গণ্য হইবে, ইহা সকলেই আলোচনা করিত। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার চরিত্র ভীষণরূপে কলুষিত হইয়া পড়িল। পূর্ব হইতেই তাহার লাম্পট্য দোষ ছিল। এক্ষণে এই লাম্পট্যের সঙ্গে মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া এবং পরদারগমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিশিখা বায়ু সংযোগে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাশী ভারতে সত্য সত্যই এক অদ্ভুত স্থান। উহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির, অসংখ্য সুন্দর ও কুৎসিত দেবীর প্রাতঃসন্ধ্যা আরতি-অর্চনায় ধর্মপিপাসু হিন্দু নরনারীর প্রাণে যেমন ভক্তি ও নিষ্ঠার ভাব উদ্রেক করে, অন্যদিকে নানা দিগ্‌দেশাগত অসংখ্য প্রকারের চোর, জালিয়াত, বিশেষতঃ লম্পট নরনারীর অবিরাম বীভৎস লীলায় পবিত্রাত্মা মানবমাত্রকেই ব্যথিত করে। জগতে যে সমস্ত জঘন্য লোকের অন্যত্র মাথা লুকাইবার



www.pathagar.com

স্থান নাই, কাশীতে তাহারা পরমানন্দে বাস করে। বহুসংখ্যক রাজ-রাজড়ার অন্নসত্র উন্মুক্ত থাকায় এই সমস্ত পাপাত্মাদিগের উদরান্নের জন্যও বড় ভাবিতে হয় না। কাশীতে প্রকৃত চরিত্রবান ভালো লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। চরিত্রহীন লম্পট ও জুয়াচোরদের সংখ্যাধিক্যে এই অল্প সংখ্যক প্রকৃত নিষ্ঠাবান চরিত্রশালী লোকের অস্তিত্বে অনেক সময়েই সন্দেহের সঞ্চার করে।

সে যাহা হউক, হেমদা কাশীর ব্যভিচার-দুষ্ট বায়ুতে এবং কুসংসর্গ প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রথম শ্রেণীর গুন্ডার মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার শরীরে বেশ শক্তি ছিল, সে শক্তি এক্ষণে নানা প্রকার পাশবিক এবং পৈশাচিক কার্য সাধনে দিন দিন দুর্দম ও অসংযত হইয়া উঠিল। গায়ের শক্তি, হৃদয়ের সাহস, টাকার বল, সহচরদিগের নিত্য উৎসাহ এবং পাপ-বিলাসের উদ্ভট-চিন্তা তাহাকে একটা সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত করিল। অনবরত কাম-পূজায় তাহার ধর্মকর্মজ্ঞান লোপ পাইল। মদের নেশা তাহাকে আরও গভীর পঙ্কে নিক্ষেপ করিল। শেষে মদ্য-সেবা এবং কাম-পূজাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হইয়া উঠিল। অবশেষে বামাচারী তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের এক কাপালিক সন্ন্যাসীর হস্তে সে তন্ত্রেমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পাপে দ্বিধাশূন্য ও নির্ভীক হইয়া পড়িল।

হেমদা বামাচারী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার কিছু পরেই সাদুল্লাপুরে প্রায় দুই বৎসর পরে বাড়ী ফিরিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার আগমনে পরমানন্দিত হইল। সে কাশী হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, ছেলেদের খেলনা, বানারসী শাড়ী, চাদর, পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য ও মূর্তি, জরীর কাঁচুলী সকলকে উপহার দিবার জন্য আনিয়াছিল। হেমদা বাড়ীতে আসিয়াই দেখিতে পাইল যে, উদ্ভিন্ন-যৌবনা প্রদীপ্তকান্তি স্বর্ণময়ী তাহাদের বাড়ী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া সে চমৎকৃত, মুগ্ধ এবং লুব্ধ হইয়া গেল। সে কাশীতে নানাদেশীয় অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে এবং নিজে অনেক সুন্দরীর সর্বনাশও করিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হইল স্বর্ণময়ীর ন্যায় কোন সুন্দরী কদাপি নেত্রপথবর্তী হয় নাই। স্বর্ণময়ী যে এরূপ রসবতী, লীলাবতী, রূপবতী এবং লোভনীয় মোহনীয় সুন্দরীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণ যেন অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ এবং মগ্ন হইয়া গেল। কাশী ত্যাগ করিতে তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ তাহার প্রাণে সমুদিত হইল। সে নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিল। পিশাচের হৃদয় পৈশাচিক ঘৃণিত বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে সর্বোৎকৃষ্ট শাড়ী, চাদর, চুড়ি, পুতুল ও পাথরের একপ্রস্ত বাসন স্বর্ণময়ীকে উপহার দিল। সরল-প্রাণা বিমলচিত্ত স্বর্ণ ভ্রাতার উপহার বলিয়া প্রাণের সহিত গ্রহণ করিল। কিন্তু দুই-তিন দিনের মধ্যেই হেমদার কুৎসিত হাবভাবে, সকাম-পিপাসু দৃষ্টিতে স্বর্ণ একটু



www.pathagar.com

সঙ্কুচিতা এবং লজ্জিতা হইল। হেমদার প্রতি তাহার একটু ঘৃণারও উদ্রেগ হইল। পাপিষ্ঠ হেমদা নানা ছলে স্বর্ণময়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া নানারূপে তাহার মনোহরণের চেষ্টা করিলেও স্বর্ণময়ী অচল অটল রহিল।

হেমদা যতই তাহাকে ধর্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্বর্ণময়ী ততই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। হেমদার চেষ্টা যতই বিফল হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের পাপ-লিপ্সা বলবতী হইতে লাগিল। তাহার আগ্রহ ও যত্ন বাড়িয়াই চলিল। মেঘ-বিহারিণী চঞ্চলা সৌদামিনী যেমন ময়ূরকে বিমুগ্ধ এবং উন্মত্ত করে, বৈদ্যুতিক শুভ্র আলোক যেমন শলভকে আত্মহারা ও আকৃষ্ট করে, বংশীধ্বনির মধুরতা যেমন মৃগকে জ্ঞানশূন্য করে, রায়-নন্দিনীর ভরা যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গও তেমনি পাপাত্মা হেমদাকান্তকে উন্মত্ত ও অশান্ত করিয়া তুলিল।

হেমদা কাশী হইতে আসিবার সময় তাহার দীক্ষাগুরু অভিরাম স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছিল। অভিরাম স্বামী সন্ন্যাসীর মত গৈরিকবাস পরিধান এবং সর্বদা কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা ধারণ করিত। বাহুতে ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা, শিরে দীর্ঘকেশ, কিন্তু জটাবদ্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত তাহার সন্ন্যাসের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোনও লক্ষণ ছিল না। সে সর্বদাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মস্তকে প্রচুর তৈল মর্দন করিত। তাহার শরীর মাংসল, মসৃণ, স্থূল এবং পেশীবহুল। সে অসুরের মত ভোজন করিত। সকালে তাহার জন্য দুই সের লুচি, এক সের মোহনভোগ ও অন্যান্য ফলমূল বরাদ্দ ছিল। দ্বিপ্রহরে অর্ধসের চাউলের ভাত, এক পোয়া ঘৃত, এক সের পরিমিত মাছ এবং দুই সের মাংস এবং অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রায় দুই সের, সর্বসুদ্ধ ছয় সের ভোজ্যজাত তাহার উদর-গহ্বরে স্থান পাইত। অপরাহ্নে দেড় সের ঘন ক্ষীর তাহার জলখাবার সেবায় লাগিত। রাত্রে রুটি ও মাংসে প্রায় পাঁচ সেরে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। তাহার ভোজন, আচরণ ও ব্যবহারে সন্ন্যাসের নাম-গন্ধও ছিল না। মদ্য সর্বদাই চলিত। তাহার চেহারা ও নয়নের কুটিলতা তীব্রভাবে লক্ষ্য করিলে সে যে একটি প্রচ্ছন্ন শয়তান তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহার গৈরিক বাস, দীর্ঘকেশভার এবং রক্ত-চন্দনের ফোঁটা হিন্দু সমাজে তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত সন্ন্যাসীর আসন প্রদান করিয়াছিল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর নামে অনেকে 'ইতঃ নষ্ট ততঃ ভ্রষ্টের' দল, শিষ্য ও চেলারূপে স্বামীজীর পাদ- সেবায় লাগিয়া গেল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কবচ লইবারও ধুম পড়িয়া গেল। বশীকরণ, উচাটন, মারণ প্রভৃতির মন্ত্র-প্রণালী ও ছিটেফোঁটা কত লোক শিখিতে লাগিল। শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে ধান্যেশ্বরীর সেবা খুব চলিল। সেকালের ইসলামীয় শাসনে মদ্য কোথায়ও ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না। এখনকার মত ব্রান্ডি, শ্যাম্পেন, শেরী, ক্লোরেট প্রভৃতি বোতলবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। কোনও মুসলমান মদ্যপান করিলে কাজী সাহেব তাহাকে কশাঘাতে পিঠ ফাটাইয়া দিতেন।



www.pathagar.com

কাজেই বড় শহরেও মদের দুর্গন্ধ, মাতালের পৈশাচিক লীলা কদাপি অনুভূত ও দৃষ্ট হইত না। হিন্দুদের মধ্যে বাড়ীতে অতি নিভৃতে ধান্যেশ্বরী নামক দেশী মদ প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ সেবন করিত। ইসলামী সভ্যতার অনুকরণে হিন্দু সমাজেও মদ্যপান ও শূকর-মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত গর্হিত এবং ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। * স্বামীজির আগমনে আর কিছু উপকার হউক আর না হউক, অনেক হিন্দু যুবকই বাড়ীতে বকযন্ত্রে মদ চোঁয়াইতে লাগিল। স্বামীজি হেমদাকান্তের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই সাদুল্লাপুরে আসিয়াছিল। দুইদিন থাকিবার কথা, কিন্তু আজ পাঁচদিন অতীত হইতে চলিল, তথাপি স্বামীজির মুখে যাইবার কথাটি নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রায়-নন্দিনী। হায় যুবতীর সৌন্দর্য! তুমি এ জগতে কতই না অনর্থ ঘটাইয়াছ! তুমি স্বর্গের অমূল্য সম্পদ হইলেও কামুক ও পিশাচের দল তোমাকে কামোন্মত্ততার তীব্র সুরা মধ্যেই গণ্য করিয়াছে। তুমি একদিকে যেমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত রমণীয় কুসুমোদ্যান সৃষ্টি করিতেছ, অন্যদিকে তেমনি পূতিগন্ধপূরিত অতি বীভৎস শ্মশানেরও সৃষ্টি করিতেছ। কেহ কেহ তোমার ধ্যান করিয়া ফেরেশতা প্রকৃতি লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু অনেকেই নরকের কামকীটে পরিণত হইতেছে।

পেটুক বালক রসগোল্লা দেখিলে তাহার মুখে যেমন লালা ঝরে, গর্ভিনী তেঁতুল দেখিলে তাহার জিহ্বায় যেমন জল আইসে, তীব্র তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি রবফ দেখিলে যেমন তল্লাভে অধীর হইয়া উঠে, বহুমূল্য মণি দেখিলে তস্কর যেমন আকুল হইয়া পড়ে, আমাদের অভিরাম স্বামী মহাশয়ও তেমনি নবযুবতী অতুল রূপবতী নির্মল রসবতী শ্রীমতী রায়-নন্দিনীকে দেখিয়া একেবারে ভিজিয়া গলিয়া গেলেন। পাষন্ডের পাপলিপ্সা যেন ফেনাইয়া ফুলিয়া উঠিল। শিষ্য এবং গুরু উভয়ে যুগপৎ রায়-নন্দিনীর জন্য দিবস-যামিনী চিন্তা করিতে লাগিল। হেমদার কু-মতলব স্বর্ণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অভিরাম স্বামীর "মনের বাসনা" স্বর্ণ দূরে থাকুক, হেমদাও বুঝিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, শিষ্য অপেক্ষা গুরু চিরদিনই পাকা থাকে। সুতরাং এখানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

হেমদা কয়েক দিনেই বুঝিতে পারিল যে, স্বর্ণকে দূষিত করা সহজ নহে। স্বর্ণ প্রথম প্রথম পূর্বের ন্যায় ভাই- বোনভাবে তাহার পাশে বসিত, কিন্তু পরে আর তাহার পাশে বসা দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখেও বাহির হইত না। এমনকি, তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করাও পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণ এক্ষণে মোহর্‌রমের দিন গণিতে

* হিন্দুশাস্ত্রে শূকর মাংস ও মদ্য পবিত্র ও ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট। কিন্তু মুসলমানেরা শূকর মাংসভোজী ও মদ্যপায়ীকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন বলিয়া মুসলমান রাজত্বে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা উহা পরিত্যাগ করেন।



www.pathagar.com

লাগিল। কারণ মোহররমের পরের দিবসই তাহাকে পিত্রালয়ে লইবার জন্য লোক আসিবে।

যত শীঘ্র হেমদার কলুষদৃষ্টি ও ঘৃণিত সংকল্প-দুষ্ট বাটি হইতে নির্গত হইতে পারে ততই মঙ্গল! কয়েক দিবসের মধ্যেই স্বর্ণ যেন বড়ই স্ফূর্তিহীনতা বোধ করিতে লাগিল। ঈসা খাঁর পত্র পাইয়া স্বর্ণ অনেকটা প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু পাপাত্মা হেমদাকান্তের ঘৃণিত ব্যবহারে বড়ই অসুখ বোধ করিতে লাগিল। একবার তাহার মামীর কাছে হেমদার ঘৃণিত সংকল্প ও পাপ প্রস্তাবের কথা বলিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিত; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে এবং তাহার নামেও হেমদা মিথ্যা, কুৎসা আরোপ করিয়া বিষম কলঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। ভাবিল, আর তিনটা দিন কাটিয়া গেলেই রক্ষা পাই। হেমদাও স্বর্ণময়ীর পিত্রালয়ে যাইবার দিন আসন্ন দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সে এবং তাহার গুরুদেব যত প্রকার তন্ত্রমন্ত্র এবং ছিটেফোঁটা জানিত, তাহার কোনটিই বাকী রাখিল না। গুরুদেব অভিরাম স্বামী হেমদার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। অভিরাম স্বামী নিজে স্বর্ণময়ীর যৌবনে মুগ্ধচিত্ত না হইলে এরূপ ভয়ানক এবং নিতান্ত জঘন্য কার্যের সংকল্প হয়ত লোক-লজ্জার জন্যও অনুমোদন করিত না। কিন্তু সে জানিত যে, হেমদার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িলে সে নিজেও দুগ্ধভান্ডে জিহ্বা লেহন করিবার সুবিধা পাইবে।

দিন চলিয়া যাইতেছে-স্বর্ণময়ী হস্তচ্যুত হইতে চলিল দেখিয়া গুরুদেবও বিশেষ চিন্তিত হইল। অবশেষে তন্ত্রের বিশেষ একটি বশীকরণ মন্ত্র সারা দিবারাত্রি জাগিয়া লক্ষবার জপ করতঃ একটি পান শক্তিপূত করিল। এই পান স্বর্ণকে স্বহস্তে সেবন করাইতে পারিলেই হেমদাকান্তের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া স্বামীজি দৃঢ়তার সাহিত মত প্রকাশ করিলেন, পানের রস গলাধঃকরণ মাত্রই স্বর্ণময়ী হেমদার বশীভূতা হইবে।

পাপাত্মা হেমদাকান্ত এই পান পাইয়া পরম আহলাদিত হইল। এক্ষণে এই পান স্বর্ণকে কিরূপে খাওয়াইবে তাহাই হেমদার চিন্তার বিষয়ীভূত হইল। সন্ন্যাসী যখন পান দিল, তখন সন্ধ্যা। স্বর্ণ তখন অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সুতরাং তাহাকে পান দিবার জন্য দুর্বৃত্তের মনে সাহস হইল না।

অতঃপর কিছু রাত্রি হইলে হেমদা সকলের অসাক্ষাতে স্বর্ণময়ীর গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের আড়ালে বসিয়া রহিল। স্বর্ণময়ী আহারান্তে গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ করতঃ শয়ন করিবার পরে পাপাত্মা মৃদুমন্দ হাস্যে স্বর্ণের নিকটে উপস্থিত হইল। স্বর্ণ সহসা তাহাকে গৃহ মধ্যে দর্শন করিয়া-পথিমধ্যে দংশনোদ্যত ফণী দর্শনে পথিকের ন্যায় বিচলিতা হইয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিল। পাপাত্মা তদ্দর্শনে



www.pathagar.com

অতীব বিনীতভাবে দুই হস্ত জোড় করিয়া বলিল, "স্বর্ণ! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। তুমি যাতে চিরকাল সুস্থ থাক, সেই জন্য সন্ন্যাসী-ঠাকুর এই মন্ত্রপূত-পান দিয়েছেন; এটা তোমাকে খেতে হবে।"

স্বর্ণঃ তুমি এখনই গৃহ থেকে নির্গত হও, নতুবা বিপদ ঘটবে, ও পান সন্ন্যাসীকে খেতে বল। আমি ও পান কিছুতেই খাব না।

স্বর্ণের দৃঢ়তা দেখিয়া হেমদা দুই হস্তে স্বর্ণের পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে পান খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। স্বর্ণ তাহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইয়া সজোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত পূর্বক দ্বার খুলিয়া তাহার ছোট মামীর গৃহের দিকে চলিয়া গেল। সহসা স্বর্ণের সবল পদাঘাতে পাপিষ্ঠ কামান্ধ হেমদাকান্ত একেবারে ঘরের মেঝেতে চিৎ হইয়া পড়িল। বুকে পদাঘাত এবং মস্তকে পাকা মেঝের শত আঘাত পাইল। কিন্তু এ আঘাত অপেক্ষা তাহার মানসিক আঘাত সর্বাপেক্ষা অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপেই হউক স্বর্ণের সর্বনাশ সাধন করিবেই।

হেমদা নিতান্ত দুঃখিত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিতভাবে সমস্তই গুরুদেবের নিকট নিবেদন করিল। অতঃপর পরামর্শ হইল যে, মোহর্‌রমের দিবস স্বর্ণকে নৌকাপথে হরণ করিয়া একেবারে কাশী লইয়া যাইতে হইবে।



www.pathagar.com

# নবম পরিচ্ছেদ
## কাননাবাসে

প্রধান সেনাপতি মাহতাব খাঁ যশোর হইতে প্রস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য কালিদাস ঢালীকে আদেশ করিলেন। ঢালী মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া কোথাও খাঁ সাহেবকে পাইল না। পরে নদীতটে যাইয়া শুনিলেন যে, খাঁ সাহেব নৌকা করিয়া বামনী নদী উজাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাইয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ঘটনা শুনিয়া প্রতাপাদিত্যের রোষানল শীতল হইয়া গেল। মনে একটু অনুশোচনার উদ্রেক হইল। মাহতাব খাঁই প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত। মাহতাবের বাহুবল এবং রণ- কৌশলেই প্রতাপের যা কিছু প্রভাব ও দম্ভ। মগ ও পুর্তগীজেরা কতবার মাহতাব খাঁর দুর্দম বিক্রমে রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রতাপ ভাবিলেন, মাহতাব খাঁ শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া তাঁহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। তিনি যদি কেদার রায় বা রামচন্দ্র রায়ের অথবা ভুলুয়ার ফজল গাজীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রতাপের পক্ষে বিষম সঙ্কট। এক্ষণে হয় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা, না হয় নিহত করাই মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল। প্রতাপ তখনি কালিদাসকে এক শত বন্দুকধারী সৈন্যসহ একখানি দ্রুতগামী তরী লইয়া মাহতাব খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। কালিদাস কালবিলম্ব না করিয়া শত সৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন। পঞ্চাশ দাঁড়ে প্রকান্ড ছিপের আকৃতি নৌকা কল্‌কল্ করিয়া বামনীর উর্মিল স্রোত বিদারণ করতঃ মাহতাব খাঁর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল।

মাহতাব খাঁর নৌকা ছয় দাঁড়ের হইলেও ক্ষুদ্র বলিয়া বেশ ছুটিয়া চলিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সারারাত্রি নৌকা বাহিতে পারিলে, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বেলা উদয়েই প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিবেন। প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিলেই তিনি নিরাপদ। মাল্লারা দাঁড় ফেলিতে যাহাতে কিছুমাত্র শৈথিল্য না করে, সে জন্য তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। মাল্লারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে লাগিল। মাঝি খাঁ সাহেবকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে শয়ন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং নৌকা যে প্রভাতেই সলিমাবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ঈসা খাঁর এলাকায় পৌছাইতে পারিবে, এ বিষয়ে খুব বড়মুখে বড়াই করিতে লাগিল।

মাহতাব খাঁ মাঝির ব্যগ্রতা এবং মাল্লাদিগের প্রতি দ্রুত দাঁড় নিক্ষেপে পুনঃ পুনঃ সাবধানতা দর্শনে নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় দেহ পাতিলেন এবং অল্পক্ষণেই নিদ্রাভিভূত


www.pathagar.com

হইয়া পড়িলেন। মাহতাব খাঁ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে মাঝি ও মাল্লারা একস্থানে নৌকা লাগাইয়া সকলেই পলায়ন করিল। তাহাদের পলায়ন করিবার কারণ যে প্রতাপাদিত্যের কঠোর দন্ডভীতি, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। খাঁ সাহেব যখন যশোরে নৌকায় আরোহণ করেন, তিনি যে যশোর হইতে পলায়ন করিতেছেন তখন মাঝিরা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তিনি সলিমাবাদে বিশেষ কোন গোপনীয় রাজকার্যে যাইতেছেন বলিয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল; কিন্তু মনোহরপুর হইতে নৌকা ছাড়িলে অরুণাবতী যখন পলায়মান-বেশে নৌকায় উঠিল তখন তাহারা বুঝিল যে, সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছেন। তাহারা নিজেদের পরিণাম ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইল; তাহারাই মাহতাব খাঁর পলায়নে সাহায্য করিয়াছে, প্রতাপ ইহা সহজেই জানিতে পারিবেন। জানিতে পারিলে তাহাদিগকে যে জান্, বাচ্চা বুনিয়াদসহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়াইয়া মারিবেন, ইহা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের গায়ে ঘর্ম ছুটিল। অন্যদিকে সেনাপতির ভয়ে নৌকা বাহনেও অস্বীকৃত হইবার সাহস ছিল না। ঘটনা যতদূর গড়াইয়াছে তাহাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। তবে নিজেদের অজ্ঞতা জানাইয়া সেনাপতির রাজকন্যা হরণের সংবাদ রাজাকে অর্পণপূর্বক আপনাদের নির্দোষত্ব জ্ঞাপন করিতে পারিলে হয়ত প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে তাহারা পলায়ন করিল। সেনাপতি সাহেব নিজের ব্যস্ততা এবং নিজের বিপচ্চিন্তার মধ্যে মাঝিদের বিপদের কথা একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই। তিনি যেরূপ উদার ও মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন, তাহাতে মাঝিরা নিজেদের বিপদের কথা খুলিয়া বলিলে তাহাদিগকে নিজের সহস্র বিপদের মধ্যেও বিদায় করিয়া দিতেন।

যাহা হউক, মাঝিরা পলায়ন করিবার প্রায় এক প্রহর পরে মাহতাব খাঁর নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি দাঁড়ের শব্দ না শুনিয়া নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন, মাঝি-মাল্লার কোন নিদর্শন নাই। নৌকা এক গাছি রজ্জু দ্বারা একটি গাছের মূলে বাঁধা রহিয়াছে। প্রকৃত রহস্য বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ তিনি অরুণাবতীকে জাগাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। মাঝিদের পলায়নে প্রতাপ-দুহিতা নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও অধীর হইয়া পড়িল। পাছে বা পশ্চাদ্ধাবিত রাজ-অনুচরদের হস্তে ধৃত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত জীবনের উদ্দাম সুখ ও প্রেমের কল্পনা মরীচিকায় পরিণত হয়। তাহার হৃদয়-তরণীর ধ্রুবনক্ষত্র, তাহার তৃষ্ণার্ত জীবনের সুশীতল অমৃত প্রস্রবণ, তাহার জীবনাকাশের চিত্তবিনোদন লোচনরঞ্জন অপূর্ব জলধনু পরে বা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, এবদ্বিধ চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ মুহূর্তে চিত্ত স্থির করিয়া অরুণাবতীকে করুণাময় আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিতে বলিয়া শেষে বলিলেন, "প্রিয়তমে! এ বিপদে তুমি যদি কোনরূপে নৌকার



www.pathagar.com

হালটি ধরে রাখতে পার, তাহলে আমি একাই দাঁড় ফেলে নিয়ে যেতে পারি। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তুমি যখন হতভাগ্যের জীবন-সঙ্গিনী হয়েছ, তাহলে দুঃখ ভোগ করা ছাড়া উপায় কি?"

মাহতাব খাঁ এমন গভীর অনুরাগ এবং শুভ্র সহানুভূতির সহিত কথাটি বলিলেন যে, প্রতাপ-বালার কর্ণে তাহা অমৃতবর্ষণ করিল। নৌকায় আরোহণ করা পর্যন্ত মাঝিদের জন্য লজ্জায় পরস্পর কোন কথাবার্তা বলিতে পারে নাই। এক্ষণে লোক-সঙ্কোচ দূর হওয়ায় এবং বিপদ সমাগমে উভয়ের হৃদয়, চক্ষু ও জিহ্বা মুক্তাবস্থায় সুরভিত প্রেমের অমিয় দৃষ্টি ও মধুর ভাষা উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল। হাতুড়ির আঘাত যেমন দুইখন্ড উত্তপ্ত ধাতুকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মলিত করিয়া দেয়, বিপদও তেমনি দুইটি অনুরাগোষ্ণ হৃদয়কে একেবারে মিলাইয়া দেয়। অগ্ন্যুত্তাপে অল্পপরিমিত দুগ্ধ যেমন বৃহৎপাত্রকে পূর্ণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, বিপদের আঁচেও তেমনি হৃদয়ের কোণে যে প্রেম, যে সহানুভূতি নীরবে আলস্যশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে তাহাও জোরেশোরে দশগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের কূল ভাসাইয়া অপর হৃদয়কে ভাসাইয়া ফেলে। তখন দুই মিশিয়া এক হয়।

অরুণাবতী বাল্যকাল হইতেই নৌ-ক্রীড়ারত ছিল বলিয়া হাল ধরিতে অভ্যস্তা ছিল। এক্ষণে বিপদকালে প্রতাপ-কুমারী হাল ধরিয়া বসিল, আর খাঁ সাহেব বীর-বাহুর বিপুল বলে হস্তে দাঁড় ফেলিতে লাগিলেন। নৌকা নদীর খর-প্রবাহ কাটিয়া কল্‌কল্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। ছয় দাঁড়ে নৌকা যেরূপ দ্রুত চলিয়াছিল, মাহতাব খাঁর দুই দাঁড়েও নৌকা প্রায় সেইরূপ ছুটিল। মাহতাব খাঁ তালে তালে দাঁড় ফেলিতেছেন, আর সুন্দরী অরুণাবতী সাবধান হস্তে হাল ধরিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে। সে হাসিতে মাহতাব খাঁও হাসিতেছেন। পরস্পরের হাসিতে উভয়ের হৃদয়ে যে কোন নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোক মরকত-দ্যুতির ন্যায় জ্বলিতেছে-ঐ নীলাকাশের তারাগুলি যদি সে প্রেমামৃতমাখা দিব্য দীপ্তি দর্শন করিত, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সমস্তগুলি আকাশচ্যুত হইয়া চিরদিনের জন্য ডুবিয়া রহিত। উর্ধ্বে অনন্ত নক্ষত্রখচিত জলদ-বিমুক্ত অনন্ত নভোমন্ডল, নিয়ে শ্যামলা ধরণী বক্ষে রজত-প্রবাহ বাম্‌নী নদী কোটি তারকার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করতঃ উদ্দাম গতিতে কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ফুটন্ত যৌবনা প্রেমোন্মাদিনী রসবতী যুবতীর ন্যায় সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে; আর তাহার বক্ষে নবীন প্রেমিক- প্রেমিকা দাঁড় ফেলিয়া হাল ধরিয়া অনন্ত আনন্দ ও অপার আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। মরি! মরি!! কি ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন লোচনরঞ্জন দৃশ্য! যে বিপদ এমন অবস্থার সংঘটন করে, তাহা সম্পদ অপেক্ষাও প্রার্থনীয় নহে কি?

নৌকা ছুটিয়াছে। আকাশে তারকা দলও ছুটিয়া চলিয়াছে। বাম্‌নী ছুটিতেছে, বাতাস



www.pathagar.com

ছুটিতেছে। এ জগতে ছুটিতেছে না কে? জগৎ পর্যন্ত, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। অনন্তকাল হইতে ছুটিতেছে, অনন্তকাল ছুটিবে। এ ছোটার কিছু শেষ নাই, সীমা নাই। রজনী পূর্ব গোলার্ধ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম গোলার্ধে ছুটিল–উষার শুভ্র আলোক– রেখা ছুটিয়া আসিয়া অম্বর–অঙ্গ–বিলম্বিত শ্বেত পতাকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। নদীবক্ষ ঈষৎ আলোকিত হইল। শীতল–সলিল–শীকর–সিক্ত–মৃদু–সমীরণ নায়ক–নায়িকার বাব্‌রী দোলাইয়া কুন্তল উড়াইয়া প্রতি মুহূর্তে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁর ঈষৎ স্বর্ণাভা–মন্ডিত শুভ্র–রজত–ফলকবৎ ললাটদেশে গুরুশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ফুটিয়াছে। মাহতাব খাঁ দাঁড় তুলিয়া সম্মুখের দিকে স্থির ও দূরগামিনী দৃষ্টিতে চাহিলেন– দেখিলেন, দূরে–অতিদূরে একখানি প্রকান্ড নৌকায় কয়েকটি বাতি জ্বলিতেছে! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল–আবার দেখিলেন,–পকেট হইতে দূরবীন বাহির করিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন বিপদ আসন্ন। অরুণাবতীও দেখিল, একখানি নৌকা তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। খালি চোখে নৌকা দেখা যাইতেছে না, কেবল আলো ছুটিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে। অরুণাবতী ব্যাঘ্রসন্দর্শনভীতা মৃগীর ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল।

মাহতাব খাঁ প্রকৃত বুদ্ধিমান বীরপুরুষের মত মুহূর্ত মধ্যে চিত্ত ও কতর্ব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। অরুণাকে বলিলেন, "অরুণে! ব্যাকুল হইও না, আল্লাহ আছেন। চল, নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় লওয়া যাক। নৌকা বেয়ে ওদের হস্ত অতিক্রম করা অসম্ভব। মুসলমান কখনও শত্রু দেখে আত্মগোপন করে না, কিন্তু আজ আত্মগোপন না করলে অমূল্য কোহিনূর তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। নৃপকিরীট–শীর্ষ–শোভী কোহিনূর কখনও কুকুরের গলায় অর্পণ করব না। অরুণা! তুমি আর বিলম্ব করো না, সমস্ত দ্রব্য গুছিয়ে পেটিকা–বন্ধ কর। আমি এখন নৌকা তীরে লাগাচ্ছি।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগিল। মাহতাব খাঁ দ্রুত নামিয়া রজ্জু দ্বারা একটি বৃক্ষমূলে নৌকা বাঁধিলেন। তৎপর দুইজনে সমস্ত জিনিসপত্র নামাইয়া জঙ্গলের মধ্যে জমা করিলেন। সমস্ত দ্রব্য তথায় পুঞ্জীকৃত করিয়া নৌকার ছই ও পাটাতনের তক্তা–সকল গভীর জঙ্গলে রাখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিলেন।

বামনীর উভয় পার্শ্বের সেই স্থলে বহুদূরব্যাপী অরণ্য। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। জঙ্গলে নানা জাতীয় বৃক্ষ। জঙ্গল এমন নিবিড় এবং বিশাল ছিল যে, তখন এখানে দলে দলে মৃগ বিচরণ এবং ব্যাঘ্র গর্জন করিত। পূর্বে শিকার উপলক্ষে দুই তিনবার মাহতাব খাঁ এ–জঙ্গলে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি এ–কাননের বিষয় অবগত ছিলেন। খাঁ সাহেব জিনিসপত্র একস্থানে রাখিয়া একস্থানে একটু দূরে বৃক্ষের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অরুণাকে লইয়া বসিলেন। হিংস্র শ্বাপদভীতির জন্য তিনি তাহার 'খুনরেজ' (রক্তপিপাসু) নামক তরবারি কোমর হইতে মুক্ত করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। জঙ্গলের ফাঁকের ভিতর দিয়া দূরবীন ধরিয়া



www.pathagar.com

মাহতাব খাঁ শত্রুতরী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উষার আলোক আরও স্ফুটতর হইয়া উঠিল। অর্ধ ঘন্টার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের প্রকান্ড নৌকা দাঁড়ের আঘাতে নদী-বক্ষে ঊর্মি তুলিয়া এবং শব্দে উভয় তটের কানন হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া মাহতাব খাঁ ও অরুণাবতীর আশ্রয়দাত্রী বনভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া সলিমাবাদের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁ অজু করিয়া ভক্তিপ্লুতচিত্তে বামনীর তটস্থ স্যাম দুর্বাদলের মখমল আস্তরণে ফজরের নামাজ পড়িয়া বিশ্বশরণ মঙ্গলময় আল্লাহ্ তাআলার পদারবিন্দে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি বর্ষণ করিলেন। অনন্তর বিশ্বলোচন অরুণদেব ভুবন-বিমোহন তরুণ অরুণিমা-জালে আকাশ মেদিনী বামনীর চঞ্চল হৃদয় এবং কাননের বর্ষাবারি-বিধৌত সরস-শ্যামল-মসৃণ তরুবল্লীর পত্রে স্বর্ণ-চূর্ণজাল ছড়াইয়া অপূর্ব শোভা ফুটাইলে মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর কর ধারণ করতঃ আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানে কিঞ্চিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অরণ্য-শাল, তাল, তমাল, সুন্দরী, ঝাউ, অশ্বত্থ, কদম্ব, বেত, কেতকী, হরীতকী, আমলকী, আম্র, খর্জুর, পনস প্রভৃতি জাতীয় অসংখ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোথাও নানাজাতীয় গুল্ম ও তৃণ বাড়িয়া ভূমি আচ্ছন্ন এবং অগম্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা মনুষ্যহস্তকৃত সযত্ন-রচিত উদ্যান অপেক্ষাও বনভূমি মনোহর। রাশি রাশি কেতকী ও কদম্ব ফুল ফুটিয়া প্রভাত সমীরে গন্ধ ঢালিয়া সমস্ত বনভূমি আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘুঘু, ফিঙ্গে, দোয়েল, স্যামা, বন্য কুক্কুট, বুলবুল, টিয়া প্রভৃতি অসংখ্য বিহঙ্গ বিবিধ স্বরে মধুর কূজনে প্রভাত-কানন চঞ্চল ও মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বন-প্রকৃতির সরস শ্যামল নির্মল নগ্ন শোভা দেখিয়া অরুণার নব প্রেমাকুল চিত্ত যেন প্রেমের আভায় আনন্দে ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক নির্মল-সলিলা সরসী দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র সরসীর চারিপার্শ্বে মখমল-বিনিন্দিত কোমল ও শ্যামল শষ্পরাজি। তাহার মধ্যে বর্ষাঋতুজ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের তৃণজাতীয় পুষ্প ফুটিয়া শ্যামল ভূমি অপূর্ব সুষমায় সাজাইয়াছে। সরোবরের জলে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া কূর্দন করিতেছে। মাঝে মাঝে শাপলা ও কুমুদ ফুটিয়া মৃদু হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। জল এত পরিষ্কার যে, নীচের প্রত্যেকটি বালুকা কণা দেখা যাইতেছে। রক্ত- রেখা-অঙ্কিত সমুজ্জ্বল শফরীর ঝাঁক রূপের ছটায় সরসীগর্ভ আলোকিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আকাশের নানাবর্ণ রঞ্জিত অম্বুদমালা আকাশসহ সরসীর তলে শোভা পাইতেছে। কি বিচিত্র দৃশ্য! কি মনোমোহিনী শোভা! দেখিয়া দেখিয়া প্রতাপ-তনয়া একেবারে মুগ্ধ-লুব্ধ এবং বিস্মিত হইয়া পড়িল। অরুণা অরণ্যভূমির উজ্জ্বল শ্যামল-বিনোদ কোমল শোভা আর কখনও দর্শন করে নাই। সুতরাং তাহার প্রেমাকুল তরুণ চিত্ত যে বনভূমির শান্তি সম্পদে, বিচিত্র সৌন্দর্যে এবং নির্জন প্রেমের সরস পুলকে মাতিয়া উঠিবে, তাহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার এত আনন্দ হইল যে, ইচ্ছা হইতেছিল সে একবার পুষ্পখন্ডিত গালিচা-বিনিন্দী কোমল ঘাসের উপর চঞ্চলা হরিণী বা প্রেমোন্মাদিনী শিখিনীর ন্যায় নৃত্য করে। মাহতাব খাঁও অরণ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা



www.pathagar.com

এবং মোহন দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার চিত্ত নগরের বহু লোক-সহবাসপূর্ণ অশান্তি ও কোলাহলময় জীবনের প্রতি ধিক্কার দিল। অলক্ষিতে তাঁহার প্রেমমদিরাকুল চিত্তের মর্ম হইতে প্রভাতকানন মুখরিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ধ্বনিয়া উঠিলঃ

"দর ফস্‌লে বাহার আগার তনে হুর শিরস্তী
পুর ময়ে কদাহ্ বমন্ দেহদ্ বর্‌লবে কীস্‌ত,
গর্‌চে বর্‌হর্ কসে সখুন্ বাশদ জীশ্‌ত।
সগ বে বমন আরজীকে বরম্ নামে বেহেশ্‌ত।।"

মাহতাব্ খাঁ সুললিত স্বরে সেই নির্জন কাননে সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গাবলীর মধুর কূজনে মধু বর্ষণ করিয়া কয়েকবার "রুবাইয়াত" টি গাহিলেন। অরুণাবতী ফার্সী জানিত না, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাহতাব খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,-"কি গাইছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মাহতাবঃ কি গাইব। তোমারই গান গাইছি।

অরুণাঃ আমার গান কেমন? গজলটা ভেঙ্গেই বলুন না।

"আচ্ছা তবে শোন," এই বলিয়া-প্রস্ফুটিত শুভ্র রজনীগন্ধা মারুত হিল্লোলে যেমন করিয়া ফুল্ল যৌবনা গোলাপ-সুন্দরীর রক্তবক্ষ স্পর্শ করে, মাহতাব খাঁও তেমনিভাবে প্রণয়- সোহাগে চম্পক অঙ্গুলে অরুণাবতীর গোলাপী কপোল টিপিয়া বলিলেন, "কবি বলিতেছেন যে, আনন্দময় বসন্তকাল পুষ্পিত নিকুঞ্জ কাননে যদি কোন অপ্সরীবৎ সুন্দরী অর্থাৎ অরুণাবতী কোমল করপল্লবে এক পাত্র মদিরা আমার অধরে ধারণ করে, তাহা হইলে কুকুর আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, যদি আর কখনও বেহেশ্‌ত কামনা করি।"

অরুণা রুবাইয়াতের ব্যাখ্যা। শুনিয়া ঈষৎ সলজ্জ কটাক্ষ হানিয়া স্মিত হাসিয়া বলিল, "বটে। কবি ত খুব রসিক।"

মাহতাবঃ আর আমি বুঝি অরসিক?

অরুণাঃ কে বলল?

মাহতাবঃ ভাবে।

অরুণাঃ কি প্রকারে?

মাহতাবঃ তবে মদিরাপাত্র কোথায়?

অরুণাঃ সে যে বসন্তকালে।

মাহতাবঃ এ বর্ষাকাল হলেও এ কাননে এখনও বসন্ত বিরাজমান।

অরুণাঃ আচ্ছা, বসন্তই যেন হ'ল; কিন্তু এখানে মদিরা কোথায়? আর তুমি মুসলমান, মদ্য যে তোমার জন্য হারাম।

মাহতাবঃ কবি যে মদ্যের কথা বলেছেন, তা' হারাম নহে।

অরুণা। সে আবার কোন্ মদ্য?

"সে এই মদ্য" এই বলিয়া মাহতাব খাঁ যুবতীকে ভুজপাশে জড়াইয়া অধরে অধর



www.pathagar.com

স্থাপন করিলেন। অধর-রসামৃত পানে উভয়েই পুলকিত শিহরিত এবং বিমোহিত হইলেন। অরুণাবতী দেখিল সমস্ত পৃথিবী যেন সুধারসে বিপ্লাবিত। সহসা একটা বুলবুল উড়িয়া আসিয়া অরুণাবতীর অতি নিকটস্থ কদম্ব শাখায় বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল। অরুণাবতী সেই বিহঙ্গের দৃষ্টিতে লজ্জিত হইয়া আনত চক্ষুতে চুম্বনাকৃষ্ট মুখ সরাইয়া লইল। যুবতী-হৃদয় যৌবনতরঙ্গে যেমন প্রেমাকুল, লজ্জায় তেমনি সদা অবগুণ্ঠিত।

মাহতাব খাঁ সরোবরের অদূরে গোলাকারে ঘন সন্নিবিষ্ট তালবৃক্ষ পূর্ণ একটি উচ্চস্থান দেখিতে পাইলেন। তাল গাছগুলির ফাঁকে বেতের লতা এমন ঘন ভাবে ঝন্যিয়াছে যে, বাহির হইতে মধ্যস্থানের নির্মল তৃণাচ্ছাদিত স্থানটুকু সহসা দেখা যায় না। অরুণাবতীও সেইখানে কানন-বাসের কুটীর নির্মাণের জন্য পছন্দ করিল। একদিকের কিঞ্চিত বেত কাটিয়া দ্বার প্রস্তুত করা হইল। অতঃপর ছোট ছোট দেবদারু ও সুন্দরী গাছ কাটিয়া মঞ্চ প্রস্তুতপূর্বক নৌকার ছই এবং গোলপাতার সাহায্যে দুইটি রমণীয় কুটীর প্রস্তুত করা হইল। কাঁচা বেত চিরিয়া তদ্বারা বন্ধনীর কার্য শেষ করা হইল।

প্রতাপাদিত্যের নৌকা বামনী হইতে ফিরিয়া না গেলে অরুণাকে লইয়া সেই ভীষণ জঙ্গল অতিক্রম করতঃ অন্যত্র যাওয়া মাহতাব খাঁর পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা ছিল। কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে আর একটি নদী আছে। সেখানে সহসা নৌকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এদিকে নৌকা ব্যতীত কোন নিরাপদ স্থানে যাইবার সুবিধা নাই। কারণ তখন সুন্দরবনের এই অঞ্চল অসংখ্য নদী-প্রবাহে বিভক্ত ও বিধৌত ছিল। হেমন্তকাল হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত অরণ্যে লোকের খুব চলাচল হইত। নল, বেত এবং নানাজাতীয় কাষ্ঠ আহরণের জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু বৃষ্টিপাত আরম্ভ ও বর্ষার সূচনা হইলেই এই সমস্ত অরণ্য জনমানবশূন্য হইয়া পড়িত। মাহতাব খাঁ একাকী হইলে, এই বনভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতাপের রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু অরুণাবতীর বিপদ ও ক্লেশ ভাবিয়া সেই কাননেই আবাস-কুটীর রচনা করিলেন। বিশেষতঃ অরুণাবতী এবং মাহতাব খাঁর প্রেম-উচ্ছ্বসিত হৃদয়, কিছুদিন এই রমণীয় কাননাবাসে বাস করিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়াছিল। নৌকায় রন্ধন করিবার পাত্রাদি সমস্তই ছিল। প্রায় দুই মণ অত্যুৎকৃষ্ট চাউল, কিছু দাল, ঘৃত, লবণ ও অন্যান্য মশ্‌লা যাহা ছিল, তাহাতে দুইজনের দুই মাস চলিবার উপায় ছিল। বনে হরিণ, নানাজাতীয় খাদ্য-পক্ষী এবং সরোবরে মৎস্যের অভাব ছিল না। মাহতাব খাঁ প্রথম দিবসেই এক হরিণ শিকার করিয়া তাহার গোশ্‌ত কাবাব করিয়া অরুণাবতীসহ পরমানন্দে উদরপূর্তি করিলেন।

অরুণাবতী মাহতাব খাঁর নিকট ইসলামের পবিত্র কলেমা পড়িয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইল। আপাততঃ আত্মরক্ষার জন্য উভয়েই সেই নিবিড় বনে বাস করিতে লাগিলেন।



www.pathagar.com

# দশম পরিচ্ছেদ
## মহররম উৎসব

১৭ই আষাঢ় মহররম উৎসব। সেকালের মহরম উৎসব এক বিরাট ব্যাপার, সমারোহকান্ড এবং চিত্ত-উন্মাদক বিষয় ছিল। মহররমের সে অসাধারণ আড়ম্বর, সে জাঁক-জমক, সে ক্রীড়া- কৌশল, সে লাঠি ও তলোয়ার খেলা, সে বাদ্যোদ্যম এবং যাবতীয় নর-নারীর মাতোয়ারা ভাবের উচ্ছ্বাস, সে বিরাট মিছিল, সে মর্সিয়া পাঠ, সে শোক প্রকাশ, সে দান খয়রাৎ, মহররমের দশদিনব্যাপী সে সাত্ত্বিক ভাব, বর্তমানে কল্পনা ও অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, আলেম-জাহেল, সকলেই মহররম উৎসবে যোগদান করিতেন। তখন বাঙ্গালা দেশে অদূরদর্শী কাটমোল্লার আবির্ভাব ছিল না। সুতরাং মহররম উৎসব তখন বেদাত বলিয়া অভিহিত হইত না। মহররমের দশ দিবস কেবল মুসলমান নহে, হিন্দুরা পর্যন্ত পরম পবিত্রভাবে যাপন করিতেন। মহররমের দশ দিবস চোর চুরি করিত না, ডাকাত ডাকাতি করিত না, লম্পট লাম্পট্য ত্যাগ করিত। ধনী ধনভান্ডার মুক্ত করিয়া গরীবের দুঃখ বিমোচন করিত। ক্ষুধার্ত অন্ন পাইত, তৃষ্ণার্ত সুমিষ্ট সরবৎ পাইত, বস্ত্রহীন বস্ত্র পাইত, প্রত্যেক লোক প্রত্যেকের নিকট সাদর সম্ভাষণ, আদর আপ্যায়ন এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পাইত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমস্ত কার্য ফেলিয়া মহররম উৎসবে যোগদান করিতেন। বীরপুরুষ অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া বীরত্ব অর্জন করিবার, কারু ও শিল্পীগণ মহররমের তাজিয়া সংগঠনে আপনাদের সূক্ষ্ম কারুকার্যের সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার, বালক-বালিকাগণ 'কাসেদ' সাজিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার, ধনী দান-খয়রাতে বদান্যতা লাভ করিবার, দেশবাসী গ্রামবাসী পরস্পরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বন্ধুত্বলাভ করিবার, দলপতিগণ বিভিন্ন দলের পরিচালনা করিয়া নেতৃত্ব অর্জন করিবার এবং সর্বোপরি সকলেই এই দশ দিন নির্মল আনন্দ, বিপুল উৎসাহ, সামরিক উত্তেজনা, শত্রু-সংহারে উদ্দীপনা এবং মিত্রের প্রতি হিতৈষণা পোষণ করিবার সুবিধা পাইত। মহররমের দশ দিন সমারোহের দিন-উৎসাহের দিন এবং পুণ্যের দিন ছিল। সমগ্র দেশ বাদ্যোদ্যমে মুখরিত-শানাইয়ের করুণ গীতিতে প্রাণ দ্রবীভূত, খেলোয়াড় এবং বীরপুরুষদিগের অস্ত্র সঞ্চালনে, হুঙ্কারে এবং সদর্প অভিযানে চতুর্দিক্ উৎসাহ আনন্দে পরিপূর্ণ-মেদিনী কম্পিত-দিঙ্মন্ডল চমকিত হইত। মিছিলের বিপুল আড়ম্বরে, তাজিয়া ও দুলদুলের বিচিত্র সজ্জায়, কারুকার্যে, পতাকার উড্ডয়নে, অশ্বারোহীদিগের অশ্ব সঞ্চালনে কি চমৎকার দৃশ্যই না প্রতিভাত হইত। মর্সিয়ার করুণ তানে প্রাণের পর্দায় পর্দায় কি করুণ রসেরই না সঞ্চার করিত। মহররমের দশ



www.pathagar.com

দিনে ইসলামের কি অতুল প্রভাবই প্রকাশ পাইত! মহাত্মা ইমাম হোসেনের অপূর্ব আত্মোৎসর্গ ও অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার উন্মাদনা গগনে গগনে পবনে পবনে নব জীবনের স্ফূর্তি ও উল্লাস ছড়াইত। রোগী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিত, ভীরু সাহস পাইত, হতাশ ব্যক্তিও আশায় মাতিয়া উঠিত। উৎপীড়িত আত্মরক্ষার ভাবে অনুপ্রাণিত হইত, বীরের হৃদয় শৌর্যে পূর্ণ হইত। মহর্‌রমের দশ দিন দিগ্বিজয়ী বিরাট বিশাল মুসলমান জাতির জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রভাব প্রকাশ পাইত। মুসলমান এই দশ দিন বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে তেজ, হৃদয়ে উৎসাহ এবং মনে আনন্দ লাভ করিতেন। সমগ্র পৃথিবীতে মহর্‌রমের ন্যায় এমন শিক্ষাপ্রদ, এমন নির্দোষ, এমন উৎসাহজনক পর্ব আর নাই। অধম আমরা, মূর্খ আমরা, অদূরদর্শী আমরা, তাই মহর্‌রম-পর্ব দেশ হইতে উঠিয়া গেল। জীবন্ত ও বীরজাতির উৎসব কাপুরুষ, অলস, লক্ষ্যহীনদিগের নিকট আদৃত হইবে কেন? বীর-কুল-সূর্য অদম্যতেজা হজরত ইমাম হোসেনের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ ও স্বাধীনতাস্পৃহার জ্বলন্ত ও প্রাণপ্রদ অভিনয়, প্রাণহীন নীচচেতা স্বার্থান্ধদিগের ভালো লাগিবে কেন? পেচকের কাছে সূর্য, কাপুরুষের কাছে বীরত্ব, বধিরের কাছে সঙ্গীত, অলসের কাছে উৎসাহ কবে সমাদর লাভ করে? যখন বাঙ্গালায় মুসলমান ছিল, সে মুসলমানের প্রাণ ছিল, বুদ্ধি ছিল, জ্ঞান ছিল, তেজ ছিল, বীর্য ছিল; তখন মহর্‌রম উৎসবও ছিল। যাহা হউক, উৎসবের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।*

মহর্‌রমের ১০ তারিখ-বাঙ্গালার পল্লী-প্রান্তর-শহর-বাজার কম্পিত করিয়া মুহুর্মুহু ইমাম হোসেনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। দ্বিপ্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই সাদুল্লাপুর হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে কল্পিত কারবালার বিশাল মাঠে চতুর্দিক হইতে বিচিত্র পরিচ্ছদধারী সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইতে লাগিল। নানাবর্ণের বিচিত্র সাজ-সজ্জায় শোভিত মনোহর কারুকার্যভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তাবুত, অসংখ্য পতাকা সমুজ্জ্বল আসা-সোটা, ভাস্বর বর্শা, তরবারি, খঞ্জর, গদা, তীর, ধনু, সড়কি, রায়বাঁশ, নানা শ্রেণীর লাঠি, খড়্গ, ছুরি, বানুটি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে, স্বর্ণসজ্জা-শোভিত, দুলদুল সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও শত শত হস্তি- শোভিত মিছিলের ক্ষুদ্রও বৃহৎ দল চতুর্দিক্ হইতে শ্রেণীবন্ধ সুশৃঙ্খল অবস্থায় কারবালার ময়দানের দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য বাদ্য নিনাদে জলস্থল কম্পিত এবং দিঙ্মন্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনশ্রেণী জল ও স্থল আচ্ছন্ন করিয়া নানা পথে নৌকায় কারবালার ময়দানে ধাবিত হইল। জন-কোলাহল সাগর-কল্লোলবৎ প্রতীয়মান

* প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মহর্‌রম উৎসবকে আবার প্রবল ও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, এতদিন পরে হিন্দুদিগের সংগঠন শক্তির ধাক্কা খাইয়া মোল্লা-মৌলবীরা এখন মহর্‌রমের সপক্ষে ফতোয়া দিতেছেন। (৪র্থ সংস্করণ)



www.pathagar.com

হইতে লাগিল। পঁচাত্তরটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিছিলের দল শতাধিক তাবুতসহ বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন পথে আসিয়া কারবালার ময়দানের বিভিন্ন প্রবেশ পথ-মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঈসা খাঁ মস্‌নদ-ই-অলীর মহর্‌রমের বিপুল মিছিল আড়ম্বর, প্রতাপ ও অসাধারণ জাঁকজমকের সহিত কারবালার নিকটবর্তী হইল। ঈসা খাঁর রৌপ্য-নির্মিত স্বর্ণ ও অসংখ্য মণি-মাণিক্য খচিত সুচারু ছত্র, অসংখ্য কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত পতাকা, দর্পণ এবং কৃত্রিম লতাপুষ্প এবং নানা বিচিত্র কারুকার্য- শোভিত ত্রিশ হস্ত পরিমিত উচ্চ, বিশাল ও মনোহর তাবুত মিছিলের অগ্রভাগে একশত ভারবাহীর স্কন্ধে বাহিত হইল। ঈসা খাঁর তাবুত দেখিবামাত্রই সেই বিপুল জনতা সমুদ্র-গর্জনে "হায়! হোসেন! হায়! হোসেন! রবে স্থাবর জঙ্গম চরাচর জগৎ যেন কম্পিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রখর কিরণে তাজিয়ার শোভা শতগুণে ঝলসিয়া উঠিল। তাজিয়ার পশ্চাতে দুই সহস্র অশ্বারোহী উর্দী পরিয়া বামহস্তে রক্তবর্ণ বিচিত্র পতাকা বিধুনন এবং দক্ষিণ করে উলঙ্গ কৃপাণ আস্ফালন করিয়া গমন করিল। তাহার পশ্চাতে পাঁচশত সুসজ্জিত স্বর্ণ-আস্তরণ-বিমন্ডিত হস্তী তালে তালে সমতা রক্ষা করিয়া পৃষ্ঠে ভীষণ ভাস্বর বর্শাধারী দুই দুই জন বীরপুরুষকে বহন করতঃ উপস্থিত হইল। তৎপশ্চাৎ দুইশত বাদ্যকর ঢাক, ঢোল, ভেরী, শানাই, পটহ, ডঙ্কা, তূরী, জগঝম্প, দফ্, শিঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যে ভূতল খতল কম্পিত করিয়া কারবালায় উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে শত শত খেলোয়াড় লাঠি, তরবারি বানুটি, সড়কির নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে ভীমতেজে অগ্রসর হইল। তৎপর নানাজাতীয় পতাকা ও ঝান্ডা পুনরায় দেখা দিল। তৎপর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণসজ্জায় শোভিত তেজঃপুণ মূর্তি মহাবীর ঈশা খাঁ শত অশ্বারোহী -বেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। তৎপশ্চাতে শুভ্র পরিচ্ছদ সমাদৃত দক্ষিণ হস্তে শ্বেত এবং বাম হস্তে কৃষ্ণ চামর-শোভিত সহস্র যুবক পদব্রজে বিলাপ এবং ব্যজন করিতে করিতে আগমন করিল। তৎপর বিপুল জনতা গৈরিক-প্রবাহের ন্যায় চতুর্দিক হইতে কারবালায় প্রবেশ করিল। ঈসা খাঁর তাবুত কারবালায় প্রবেশ করিলে, অন্যান্য মিছিলের দল নানাপথে উল্লাস ও আনন্দে হুঙ্কার করিয়া কারবালায় প্রবেশ করিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান-কুলমহিলাগণ তাঞ্জামে চড়িয়া সূক্ষ্ম যবনিকায় আবৃত হইয়া উৎসবক্ষেত্রের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য হিন্দু মহিলা লাল, নীল, সবুজ, বাসন্তী প্রভৃতি বর্ণের শাড়ী পরিয়া সিঁথিতে সিন্দুর মাখিয়া, নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, গুজরী মল, নূপুরের রুণু রুণু ঝুমু ঝুমু এবং ঝন্ ঝন্ কৃণ্ কৃণ্ শব্দে পল্লী ও প্রান্তরবক্ষে আনন্দনিস্কণ জাগাইয়া, রূপের ছটায় পথ আলোকিত করিয়া, কথার ঘটায় হাসির লহর তুলিয়া চঞ্চল শফরীর ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইল। মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে সহস্র সহস্র



www.pathagar.com

তরুণী নানাবর্ণের নিশান উড়াইয়া দাঁড়ের আঘাতে জল কাটিয়া বাইচ দিতে লাগিল।' অসংখ্য বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর উৎফুল্ল মুখকমলের আনন্দ-জ্যোতিঃতে মাথাভাঙ্গার জল-প্রবাহ আলোকিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। নদীর পত্রেই ঘোড়দৌড়ের বাঁধা রাস্তা; তাহাতে শত শত ঘোড়া প্রতিযোগিতা করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহর্‌রমের শিনী স্বরূপ নানা শ্রেণীর মিষ্টান্ন পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। খেলোয়াড়গণ শত শত দলে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকার ব্যায়াম, অস্ত্র-চালনা এবং ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিশাল ময়দানে এক মহা সামরিক চিত্তোন্মাদকর দৃশ্য। অগণিত নরনারী সেই মহা উত্তেজনাকর ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ ও লুব্ধ হইতেছে। মুহুর্মুহুঃ সেই বিশাল জনতা "ইমাম হোসেন কি-ফতেহ্" বলিয়া গগন-ভুবন কম্পিত করিতেছে। শত শত বালক তাম্বুর চূড়ার ন্যায় লম্বা টুপী মাথায় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া "হায়! হোসেন! হায়! হোসেন!" রবে প্রকৃতির বক্ষে শোকের দীর্ঘ লহরী তুলিতেছে। ধনাঢ্য নরনারীগণ তাবুত লক্ষ্য করিয়া পুষ্প, লাজ, পয়সা ও কড়ি বর্ষণ করিতেছে। দরিদ্ররা পয়সা ও কড়ি আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইতেছে। কেহ কেহ রাশি রাশি বাতাসা বর্ষণ করিতেছে। বালকের দল সেই বাতাসার লোভে হুড়া-হুড়ি, পাড়াপাড়ি করিতেছে। বিশাল ময়দানের চতুর্দিকে তাবুত লইয়া মিছিলসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর মধ্যস্থলে অযুত লোক লাঠি তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে। গায়কগণ স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া করুণকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কারবালার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সঙ্গীতালাপে প্রকাশ করিতেছে। ধন্য ইমাম হোসেন! তুমি ধন্য! তোমার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় এবং চিরজীবিত আর কে? ধন্য তোমার স্বার্থত্যাগ। ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!! ধন্য তোমার স্বাধীনতা-প্রিয়তা! শত ধন্য তোমার অদমনীয় সাহস ও শৌর্য। তোমার ন্যায় বীর আর কে? তোমার ন্যায় স্মরণীয়ই বা আর কে? প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তোমার ন্যায় আর কে আত্মত্যাগ করিয়াছে? "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এ প্রতিজ্ঞা তোমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। পূণ্যভূমি আরবের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ইসলামের পবিত্রতম প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, মৃত্যুর করাল গ্রাস এবং নির্যাতন ও অত্যাচারের ভীষণ নিষ্ঠুর যন্ত্রণাও তোমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তুমি সবংশে ধ্বংস হইলে, তথাপি অন্যায়ের প্রভুত্বের নিকট মস্তক নত করিলে না। আজ অত্যাচারী এজিদের স্থান এবং তোমার স্থানের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান। তুমি আজ জগতের যাবতীয় নর-নারীর কণ্ঠে কীর্তিত, হৃদয়ে পূজিত। তুমি কারবালায় পরাজিত এবং নিহত হইয়াও আজ বিজয়ী এবং অমর।

মহর্‌রম উৎসব খুব জোরে চলিতে লাগিল। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম গগনপ্রান্তে দ্রুত



www.pathagar.com

নামিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিবসের শেষ-রশ্মি বৃক্ষের অগ্রভাগে উত্থিত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে দুই একটি তারকা নীলাকাশে ফুটিতে লাগিল। আর দেখিতে দেখিতে অমনি জল-স্থল সহসা প্রদীপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র মশাল কারবালা ক্ষেত্রে জ্বলিয়া উঠিল। নানাবর্ণের মাহাতাব, তুবড়ী এবং হাওয়াই জ্বলিয়া জ্বলিয়া কারবালার হত্যাকান্ডের দারুণ রোষানল উদগীর্ণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বোমের আওয়াজে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সহস্র সহস্র আগুনের বানুটি খেলোয়াড়দিগের হস্তে অদ্ভুত কৌশলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কি অপূর্ব দৃশ্য! প্রস্তরময় মনুষ্য! প্রান্তরময় অনলক্রীড়া! নদীগর্ভে অনল-ক্রীড়া! আকাশে অনল-ক্রীড়া! জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিপুল উৎসাহ। বিপুল আনন্দ!! বিপুল কোলাহল!! বিপুল ফূর্তি!!!

সাদুল্লাপুর মিত্রদের বাড়ী হইতেও বিপুল সমারোহে তাজিয়ার মিছিল বাহির হইয়া কারবালায় আসিয়াছিল। পাঠকগণ! অধুনা ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যে-সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তখনকার ঘটনা ইহাই ছিল। বাদশার জাতি মুসলমানের সকল কার্যেই হিন্দুর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি ছিল। মুসলমানের মস্‌জিদ এবং পীরের দরগা দেখিলে সকল হিন্দুই মাথা নোয়াইত। মুসলমানের ঈদ পর্বেও হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পান, আতর এবং মিষ্টান্ন উপহার দিত। মুসলমানের পোষাক পরিয়া হিন্দু তখন আত্মাভিমান বোধ করিত। মহর্‌রম পর্ব ত হিন্দুরা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল। আজিও বাংলার বাহিরে বিহার এবং হিন্দুস্তানের হিন্দুরা মহর্‌রম পর্বে মুসলমানের ন্যায়ই মাতিয়া উঠে। অনেক রাজ-রাজড়াদের বাড়ীতে দস্তুরমত তাবুত উঠে এবং মিছিল বাহির হয়। আজিও হিন্দুস্তানে মহর্‌রম পর্বে হিন্দু-মুসলমানে গভীর একপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়।*

সাদুল্লাপুর মিত্রদের বাড়ী হইতে স্থলপথে মিছিল আসিয়াছিল। আর জলপথে দুইখানি সুসজ্জিত পিনীসে বাড়ীর গিন্নি ও বধুরা, অন্যখানিতে স্বর্ণময়ী, মালতী এবং অন্যান্য বালক-বালিকা। মাল্লারা নৌকা বাইচ দিতেছিল। বরকন্দাজেরা দাড়ি-গোঁফে তা দিয়া ঢাল-তলওয়ার লইয়া পাহারা দিতেছিল। হেমদাকান্ত এবং অন্যান্য যুবকেরা আশ্বারোহণে আসিয়াছিল। কাপালিক ঠাকুর রক্তবর্ণ চেলি পরিয়া কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণময়ীদের নৌকায় চড়িয়া মহর্‌রমের উৎসব দেখিতেছিল। নদীগর্ভে একস্থানে ঈসা খাঁর কয়েকখানি রণতরী নৌযুদ্ধের অভিনয় করিতেছিল। স্বর্ণময়ী সেই অভিনয়ই সাভিনিবেশে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

ঈসা খাঁ যে স্বর্ণময়ীর সহিত মহর্‌রম উৎসবের দিন দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, হেমদাকান্ত তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল। কারণ ইহা গোপনীয় বিষয় ছিল না। দুর্মতি

---

* অধুনা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফলে হিন্দুসভা হইতে নিষেধের ফতোয়া জারির ফলে হিন্দুস্তানের হিন্দুরাও মহর্‌রম হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। (৪র্থ সংস্করণ)



www.pathagar.com

হেমদাকান্ত এক্ষণে এই ছলে স্বর্ণকে হরণ করিবার জন্য একটা কৌশল বিস্তার করিল। হেমদা নৌকার পাহারাওয়ালা বরকন্দাজদিগকে সহসা ডাকিয়া কয়েকটি ঘোড়া রক্ষা করিবার ভার তাহাদিগকে দিয়া, "আমি আসছি, তোমরা অপেক্ষা কর" বলিয়া সঙ্গের কয়েকটি কাশী-নিবাসী আগন্তুক বন্ধু লইয়া স্বর্ণের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মালতী! তুই এবং অন্যান্য সকলে নেমে অন্য নৌকায় উঠ, এ নৌকা তাজিয়া-ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। তথায় নবাব সাহেব স্বর্ণকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছেন।" হেমদাকে বাটির ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত ভয় করিত। সুতরাং হেমদা বলিবা মাত্রই তাহার অন্য নৌকায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অভিরাম স্বামী নৌকা হইতে নামিয়া ডাঙ্গায় উঠিল। মাঝি-মাল্লারা পিনীস তাড়াতাড়ি বাহিয়া তাজিয়াঘাটা পানে ছুটিল। হেমদার সঙ্গের ভদ্রবেশধারী কতিপয় ব্যক্তি নৌকায় উঠিয়া পড়িল। 'ইহারা ঈসা খাঁর লোক, স্বর্ণকে লইতে আসিয়াছে, মাঝি-মাল্লারা ইহাই মনে করিল।

হেমদা এবং স্বামীজী দুইজন, জনতার মধ্যে মিশিয়া নানাস্থানে ক্রীড়া- কৌতুক এবং আতসবাজী দেখিতে লাগিল। অনেক বিলম্বে তাহারা বরকন্দাজদিগের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই তাড়াতাড়ি বলিল, "যাও, যাও, তোম্‌লোগ্ জল্‌দি তাজিয়া-ঘাটামে বিস্তীকে হেফাজত মে যাও। ওঁহা নবাব সাহেবকা সাথ মোলাকাত কর্‌নেকে লিয়ে রাজকুঙারী তশ্‌রিফ লে গেয়ি হায়। জল্‌দি ওঁহা যানা।" বরকন্দাজেরা "হুজুর", বলিয়া তাজিয়া-ঘাটের দিকে দৌড়াইল।

অভিরাম স্বামী পূর্বেই মাঝি এবং মাল্লাদিগকে একটি এমন ঔষধ পানের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিয়াছিলেন যে, তাহারা তাজিয়া-ঘাটায় নৌকা লইয়া যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেই বেহুশ এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। তখন সেই ছদ্মবেশী গুন্ডার দল পাল তুলিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিমগামী একটা ক্ষুদ্র শাখার দিকে নৌকা চালাইল। নৌকা ভরা-পালে উড়িয়া চলিল।



www.pathagar.com

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## যুদ্ধ

রাত্রি অর্ধ প্রহরের পর মহর্‌রম-উৎসব শেষ হইলে, নবাব ঈসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলী যখন জগদানন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া স্বর্ণময়ীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন, তখন চারিদিকে তাজিয়া-ঘাটায় স্বর্ণের অনুসন্ধান হইল। কিন্তু স্বর্ণ এবং তাঁহার নৌকার কোনও খোঁজ-খবর কোথায়ও পাওয়া গেল না। সকলেই মহাব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে বহু নৌকা, লোকজন এবং গুপ্তচর প্রেরিত হইল। শ্রীপুর হইতে রাজা কেদার রায় চতুর্দিকে বহু গুপ্তচর ও সন্ধানী পাঠাইলেন। নবাব ঈসা খাঁও অনেক লোকজন পাঠাইলেন। হেমদাকান্ত তাঁহার গুরু অভিরাম স্বামীকে লইয়া এই সুযোগে স্বর্ণময়ীকে খুঁজিবার ছলে সাদুল্লাপুর পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণময়ীর পিনীসের মাঝি-মাল্লাদিগকে তিন দিন পরে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় এক জঙ্গলের ভিতর পাওয়া গেল। নানা ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের চৈতন্যবিধান করা হইল বটে, কিন্তু তাহারা তাজিয়া ঘাটে উপস্থিত হইবার পরের কোনও ঘটনাই বলিতে পারিল না। কতিপয় ভদ্রলোক ঈসা খাঁর অনুচররূপে হেমদার নিকট উপস্থিত হইয়া তাজিয়া-ঘাটে নৌকা লইতে আসে, হেমদাকান্তের আদেশেই তাহারা নৌকা লইয়া তাজিয়া ঘাটে উপস্থিত হয়। এই পর্যন্ত মাঝি-মাল্লাদিগের নিকট সন্ধান পাওয়া গেল। যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাহা হইতে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের লোকেরাই ঔষধ প্রয়োগে নৌকা-বাহকদিগের সংজ্ঞা হরণ করিয়া স্বর্ণময়ীকে হরণ করিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর নগরে বহু সুদক্ষ চর প্রেরিত হইল, কিন্তু স্বর্ণময়ীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কেদার রায়, তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায়, জগদানন্দ মিত্র এবং ঈসা খাঁ সকলেই স্বর্ণময়ীর জন্য বিষম ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ এবং প্রতাপের ধ্বংস সাধনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের বক্ষের উপর মৃত্যুর শূল বসাইতে না পারিলে স্বর্ণময়ীর যে কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না ইহাই সকলের বিশ্বাস। ঈসা খাঁ তাঁহার হৃদয় আকাশের প্রেম-চন্দ্রমা, তাঁহার জীবন-বসন্তের গোলাপ-মঞ্জুরী, যৌবন-উষার কোকিল-কাকলী, মানস-সরসীর প্রীতির কমল, অনুরাগ-বীণার মোহন মূর্ছনা, চিরসাধের স্বর্ণময়ীর জন্য একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কি করিবেন, তদ্বিষয়ে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে কেদার রায় কন্যা-শোকে একান্ত বিচলিত এবং অভিভূত হইয়া ঈসা খাঁর সাহায্যে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। ঈস খাঁও এ বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। প্রথমত প্রতাপকে ভয় প্রদর্শনের দ্বারা স্বর্ণময়ীর



www.pathagar.com

উদ্ধার মানসে এক পত্র দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা হইল যে, পত্রপ্রাপ্তি মাত্র স্বর্ণময়ীকে প্রত্যার্পণ না করিলে, তাহার রাজ্য ও জীবন নিরাপদ হইবে না। প্রতাপাদিত্য এই পত্র পাইয়া তেলে- বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বর্ণময়ীর অপহরণের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। অকারণে তাঁহার উপর স্বর্ণময়ী-হরণের দোষারোপ, অধিকন্তু রাজ্য ও জীবন বিনাশের ভীতি-প্রদর্শনে প্রতাপ ক্রোধে ও অপমানে গর্জিয়া উঠিলেন। প্রতাপ অত্যন্ত তীব্র ও অপমানজকন ভাষায় কেদার রায়কে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। সে প্রত্যুত্তরের তীব্র-তীক্ষ্ণ বাক্য-শেল রাজা কেদার রায় এবং নবাব ঈসা খাঁকে তখন বিষম ব্যথিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপাদিত্য সতর্কতাপূর্বক একদল পর্তুগীজ গোলন্দাজ এবং পাঁচ হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সহস্রাধিক নৌকা সাহায্যে নদীপথে কেদার রায়ের রাজ্যে অতর্কিত অভিযান করিলেন। কেদার রায়ের রাজ্যের প্রান্তপাল সৈন্যগণ প্রবল-প্রতাপ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। প্রতাপ শাহবাজপুর হইতে স্থলপথে অতি দ্রুতবেগে বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ-সঙ্কুল ঝটিকাবর্তের ন্যায় রাজা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সহসা প্রতাপের এতাদৃশ অগ্রগতি শ্রবণে কেদার রায় প্রথমতঃ বিচলিত, পরে রাজধানী শ্রীপুরের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল লইয়া প্রবল তেজে প্রতাপাদিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং দূত পাঠাইয়া ঈসা খাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিন দিবস অবিরাম যুদ্ধের পরে রাজা কেদার রায় পরাস্ত হইয়া শ্রীপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য, গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে দুর্জয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবস প্রাতে ঈসা খাঁ চারি হাজার পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইলেন। প্রতাপাদিত্যের খ্যাতনামা সেনাপতি কালিদাস ঢালী সাত হাজার পদাতিক এবং নয়শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উদয়গড় নামক স্থানে ব্যূহ-বিন্যাস করিয়া ঈসা খাঁর সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিল। লাঠি, তরবারি, বন্দুক ও তীর সমানভাবে সংহার-কার্য সাধন করিল। উভয় সেনাদল মরিয়া হইয়া যুঝিতে লাগিল। ঈসা খাঁ বিপুল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও বিচ্ছিন্ন করতঃ গভীর হুঙ্কারে দিঙ্মন্ডল চমকিত করিয়া শ্রীপুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কালিদাস-পরিচালিত সেনাদল যাহাতে পুনরায় একত্র হইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আজিম খাঁ শূর নামক জনৈক সুদক্ষ বীর-পুরুষের অধীনে আড়াইশত অশ্বারোহী সেনা রাখিয়া নিজে ঝঞঝা গতিতে শ্রীপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। সমস্ত দিন ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদয়গড়



www.pathagar.com

হইতে কুচ করিয়া রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইয়া নিঃশব্দে রণক্লান্ত সৈন্যদিগকে আহার ও বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে আদেশ দিলেন। চতুর্দিকে চৌকি স্থাপন করিয়া স্বয়ং সতর্কভাবে সমস্ত সেনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতেই দুইশত অশ্বারোহী এবং এক সহস্র পদাতিক লইয়া বজ্রের ন্যায় ভীষণ গতিতে শত্রু-সেনার উপরে পতিত হইবার জন্য কুচ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে সমর-সজ্জায় প্রস্তুত এবং আহবানমাত্রেই ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুকুলে আপতিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া গেলেন।



www.pathagar.com

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## গুরু—শিষ্য

কাপালিককুল-চূড়ামণি অভিরাম স্বামী এবং পাপাশয় হেমদাকান্ত স্বর্ণকে খুঁজিবার ছল করিয়া তাহাদের আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নৌকাযোগে সাদুল্লাপুর পরিত্যাগ করিল। হেমদাকান্তের সহকারী গুন্ডার দল স্বর্ণকে লইয়া পূর্ব পরামর্শানুসারে ইদিলপুরের নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। তখন স্বর্ণকে লইয়া নৌকাপথে বেশীদূর ভ্রমণ করিলে, পাছে কেহ কোন সন্ধান পায়, এজন্য স্বামী ও শিষ্য ইদিলপুরের নির্জন কাননেই আপনাদের পাপ অভিসন্ধি সম্পাদনের নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়াছিল। গুন্ডার দল স্বর্ণময়ীকে লইয়া সেই কাননাভ্যন্তরে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতেছিল। তিন দিবস পরেই পাপাত্মা অভিরাম স্বামী ও হেমদাকান্ত সেই কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহারা রোরুদ্যমনা এবং ক্ষিপ্তমনা স্বর্ণকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিতে এবং প্রবোধ দিতে ও পাপ-প্রলোভনে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। স্বর্ণময়ী তাহাদের বাক্য শ্রবণে যার-পর-নাই মর্মপীড়িতা হইল। সে কখন ক্রন্দন, কখন তর্জন-গর্জন করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। স্বর্ণের মানসিক উত্তেজনা এবং উৎক্ষিপ্ত-ভাব দর্শনে স্বামী-শিষ্য মিলিয়া তাহাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। স্বর্ণ যখন দেখিল, তাহার কষ্ট ও নির্যাতন চরমে উঠিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যে পাপ-সংকল্পে সম্মত না হইলে, পাষন্ডদ্বয় বল-প্রকাশেও কুণ্ঠিত হইবে না তখন সে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এক কৌশলজাল বিস্তারের কল্পনা করিতে লাগিল। মাকড়সা যেমন আশ্রয়শূন্য হইলেই নিজের দেহের ভিতর হইতে সূত্র নির্গত করিয়া জাল নির্মাণপূর্বক আপনাকে আশ্রয়-সংস্থিত করে, মানুষও তেমনি বিপদে পড়িলেই তাহার অন্তরস্থ আত্মা তাহাকে নূতন বুদ্ধি-কৌশল উদ্ভাবনের কল্পনায় মাতাইয়া তোলে। স্বর্ণ দেখিল, অভিরাম স্বামীও তাহাতে মুগ্ধ এবং লুব্ধ। হেমদা এবং স্বামীজি উভয়েই তাহার শিকার। সুতরাং আপাততঃ একজনকে ভালোবাসার ছলনায় মুগ্ধ করিতে পারিলেই অন্যের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত অনিবার্য। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিতে পারিলে, হয়ত তাহার উদ্ধার হইবার কোন পথ খুলিয়া যাইতে পারে। এই সংকল্পে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বামীজি এবং হেমদাকান্তের সহিত কথোপকথন করিতে ও স্বামীজির প্রতি একটু বেশী ভালোবাসা দেখাইতে লাগিল। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসের ফরমায়েস করিতে লাগিল। অন্যান্য লোক থাকিলে তাহার সঙ্কোচ



www.pathagar.com

ও লজ্জা বোধ হয়, এই অছিলায় সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দেওয়াইল। এক্ষণে এই নিবিড় অরণ্যে স্বামীজি, হেমদা এবং স্বর্ণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না।

স্বর্ণকে লইয়া প্রথম প্রথম স্বামীজি ও শিষ্যের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি, তৎপর অত্যল্পকাল মধ্যেই কলহ হইতে লাগিল। স্বর্ণ চালাকী করিয়া সে কলহে স্বামীজির পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, স্বামীজি সম্মুখে আসিলেই সে আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু হেমদাকে দেখিলেই সে লজ্জা ও ঘৃণায় ঘোমটা টানিয়া বসে। ইহাতে হেমদার দিনদিন স্বামীজির প্রতি জাতক্রোধ হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্ণময়ী একদিন সুযোগ বুঝিয়া, হেমদা কার্যোপলক্ষে একটু দূরে গেলে পর, স্বামীজিকে ডাকিয়া বলিল, "আমি যখন ভাগ্য-দোষে অকূলে পতিত হয়েছি, তখন কূলে উঠবার আর আশাও নাই, ইচ্ছাও নাই। কূলে উঠলে লোক-গঞ্জনায় গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে হবে। সুতরাং মনে করেছি, অকূলে থেকেই একটা কূলে আশ্রয় নেব। দুই কূল ত আশ্রয় করতে পারব না। একটা মন দু'জনকে দিতে পারব না। গুরু থাকতে লঘুকে বরণ করতে পারব না। কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দেখছি, তাতে বোধ হয়, শিষ্যই অবিলম্বে আমাকে উচ্ছিষ্ট করবে। কিন্তু সেরূপ হলে নিশ্চয় জেনে রেখ, আমি আত্মহত্যা করব। তোমাকেই স্ত্রী-হত্যার পাতকভাগী হ'তে হবে। ঠাকুর! যদি আমার জীবনে তোমার মমতা থাকে, তা হ'লে আমাকে নিয়ে পলায়ন কর।"

অনলস্পর্শে তুবড়ীবাজি যেমন অসংখ্য ফুলিঙ্গে প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, স্বর্ণময়ীর অনুরাগপূর্ণ হিত-পরামর্শে অভিরাম স্বামীর হৃদয় আশা, আনন্দ ও উৎসাহে তেমনি নাচিয়া উঠিল।

কুকুর যেমন প্রভুহস্ত হইতে মাংসখন্ড পাইবার সম্ভাবনায় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, কাম-কুকুর অভিরাম স্বামীও স্বর্ণময়ীর পরামর্শে তেমনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়-উদ্যানের শুষ্ক কুঞ্জে সহসা লক্ষ কুসুম ফুটিয়া উঠিল! স্বর্গ-রাজ্য তাহার চরণতলে গড়াগাড়ি যাইতে লাগিল। নিরাশার মরু-সৈকত বিপ্লাবিত করিয়া সুপ্ত প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর, যাহা কেবল তাহার হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণে লুক্কায়িত ছিল-প্রবল তরঙ্গভঙ্গে আবর্ত রচিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়া চলিল। পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। পর দিবস রাত্রি থাকিতেই হেমদাকে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া সেই কানন-পথেই পলায়ন করিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতেই অভিরাম স্বামী শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বর্ণকে লইয়া সেই কাননের অন্ধকার পথে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকাপথে অন্য কোন দিকে পলায়ন করিলে, হেমদা তাহার সন্ধান পাইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই কাননের দক্ষিণভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপালিক চিন্তা করিল যে, আমরা যে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় এই কাননের অন্যত্র আশ্রয় লইব, হেমদা তাহা কল্পনাও



www.pathagar.com

করিতে পারিবে না।

এদিকে হেমদা যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণ ও অভিরাম স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন যেন থামিয়া যাইতে লাগিল। সে চঞ্চল পদে এদিক্-ওদিক্ খুঁজিয়া দুইজনের একজনকেও দেখিতে পাইল না। শেষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, উভয়ের বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান হালকা জিনিস-পত্র কিছুই নাই। তখন হেমদা দুঃখে ও ক্ষোভে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। অভিরাম স্বামী তাহার চক্ষে প্রকট শয়তান বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার প্রতিহিংসা বহ্নি একেবারে নভঃস্পর্শী হইয়া উঠিল। তাহাকে অনন্তকাল নরকানলে দগ্ধ করিলে এবং কুটী কুটী করিয়া কাটিলেও তাহার ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইবে না।

স্বর্ণ এবং স্বামীজি কোন্ পথে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তন্নির্ধারণই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। সে অনেক ভাবিয়া শেষে কাননপথেই উড়ো-পাখীর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। স্বামী এবং স্বর্ণ যে-পথে পলায়ন করিয়াছিল, সে-পথে অনেক লতা ও গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন এবং নত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বর্ষা-বারি-পুষ্ট ঘাসের মাথা দলিত হইয়াছিল। হেমদা বহু কষ্টে সেই সমস্ত চিহ্নের অনুসরণ করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী এবং স্বর্ণময়ী দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত চলিতেছিল। বেলা দুই প্রহরের সময় তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এক স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সঙ্গে যে যৎসামান্য ফল-মূল ছিল, স্বামীজি পরম যত্নে তাহা স্বর্ণকে খাওয়াইতে লাগিল। যে স্থানে বসিয়া তাহারা জলযোগ করিতেছিল, সে স্থান মাহতাব খাঁর আশ্রয় হইতে বেশী দূর নহে। স্বর্ণ এবং অভিরাম স্বামী জলযোগান্তে সে স্থান হইতে প্রায় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে অপহৃত-শিকার শার্দুলের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও রুদ্রমূর্তি হেমদাকান্ত পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া একলম্ফে অভিরাম স্বামীর স্কন্ধদেশে ভীষণ খড়্গ প্রহার করিল। অভিরাম স্বামী বিকট চীৎকার করতঃ বনভূমি বিকম্পিত করিয়া দশ হাত দূরে যাইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার বিক্ষত স্কন্ধদেশ হইতে অজস্রধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। হেমদা রোষাবেশে কম্পিত এবং প্রদীপ্ত হইয়া অত্যন্ত তীব্র কটূক্তিতে অভিরাম স্বামী ও স্বর্ণময়ীর মর্মবিদ্ধ করিতে লাগিল। দারুণ ঘৃণায় অভিরাম স্বামীর মস্তকে গুরুতর পদাঘাত করিল। অতঃপর বিকট গর্জন করিয়া রক্তরঞ্জিত-শাণিত-খড়্গ উদ্যত করতঃ স্বর্ণকে বলিল, "বল্, এখন তোর মতলব কি?" এই বলিয়া নিতান্ত অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় স্বর্ণকে গালাগালি করিতে লাগিল। স্বর্ণ তখন লজ্জা, রোষ এবং ক্ষোভে দলিতা ফণিনীর ন্যায়, সন্তপ্তা সিংহীর ন্যায়, কুকুরাক্রান্ত নিরুপায় মার্জারের ন্যায়, -বৃকতাড়িত মহিষীর ন্যায় নিতান্ত প্রখরা মূর্তি ধারণ করিল। বন-পথে আসাকালীন অভিরাম স্বামী একখানি তলওয়ার লইয়া



www.pathagar.com

আসিয়াছিল। স্বর্ণময়ী মুহূর্ত মধ্যে ভূতল হইতে সে তরবারি উত্তোলন করিয়া সংহারিণী-মূর্তিতে-দৃষ্টিতে অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া বলিল, "পাপাত্মা হেমদা। আয় দেখি তোর কত শক্তি ও সাহস! তোর পাপ-বাসনা অদ্য রক্তধারে নির্বাপিত করব।" এই বলিয়া বিপন্না সতী তাহার গ্রীবামূল লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তরবারি প্রহার করিল। পলকে হেমদাকান্ত ঈষৎ পশ্চাতে হঠিয়া গেল, তাহাতে অসি গ্রীবামূলে না লাগিয়া বাহুমূলে লাগিয়া অনেকটা কাটিয়া গেল। হেমদা তখন স্বর্ণময়ীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় খড়্গ প্রহারার্থে উদ্যত হইল। এমন সময়ে অভিরাম স্বামীর বিকট চীৎকারে উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী হইয়া মাহতাব খাঁ তথায় উপস্থিত হইয়া "কি কর, কি কর" বলিয়া হেমদার উপরে ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পতিত হইলেন এবং তরবারির আঘাতে হেমদার হস্তের খড়্গ মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর মুহূর্ত মধ্যে হেমদার বক্ষে এক প্রচন্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী এবং বন্দী করিলেন।



www.pathagar.com

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## উপযুক্তপ্রতিফল

উষার শুভ্র হাসি পূর্ব-গগনে প্রতিভাত হইবার পূর্বেই-বিহগ-কণ্ঠে ললিত কাকলী উদগীত হইবার বহু পূর্বেই ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী সহস্র পদাতিক, দুইশত সার্দি লইয়া বজ্র-প্রতাপে, প্রতাপের সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। প্রতাপ-সৈন্য সহসা পশ্চাদদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ভীত, চকিত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনবরত অস্ত্রাঘাতে তাহারা কদলী তরুর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। উষালোক প্রকাশমান হইলে প্রতাপের সৈন্যদল ঈসা খাঁর সেনাবল নিতান্ত অকিঞ্চিতকর দর্শনে অতিমাত্র সাহসী হইয়া বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে ঈসা খাঁর অবশিষ্ট বাহিনী ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত্যার ন্যায় বিদ্যুত্তেজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহা সংহার আরম্ভ করিল। কেদার রায়ের সৈন্যগণও দূর্গ হইতে নির্গত হইয়া ভীম তেজে প্রতাপ-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। ঈসা খাঁর গোলন্দাজ সেনা অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রতাপের পর্তুগীজ সৈন্য পরিচালিত তোপগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বহু পর্তুগীজ আহত ও নিহত হইল। অসংখ্য তরবারি সঞ্চালনে মনে হইল যেন গগনমন্ডলে অসংখ্য বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। বৈশাখের ঝটিকা যেমন মেঘদলকে বিচ্ছিন্ন করে, ঈসা খাঁর প্রবল প্রতাপে তেমনি যশোহরের সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন, দলিত, নিহত এবং আহত হইয়া সমর-ক্ষেত্র আচ্ছাদিত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। পরাজয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপর হইলে, ঈসা খাঁ শোণিত-রঞ্জিত কৃপাণ হস্তে ঘূর্ণিতলোচনে, শত্রু-সংহারক-বেশে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া তরবারি বিস্তারপূর্বক গতিরোধ করিলেন। ঈসা খাঁ প্রতাপাদিত্যের তরবারি ঢালে উড়াইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এখনও স্বর্ণময়ীকে দিতে স্বীকৃত হও, নতুবা আজ তোমার রক্ষা নাই। আজ মুসলমান তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিয়ে যে-ব্যক্তি পরের কন্যাকে দস্যুর ন্যায় হরণ করে, তাকে আমি দস্যুর ন্যায়ই হত্যা করে থাকি। স্বর্ণময়ী কোথায়? প্রকাশ করলে এখনও তোমাকে প্রাণদন্ড হতে অব্যাহতি দান করতে পারি!" ঈসা খাঁর বাক্যে প্রতাপ বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং 'ঈসা খাঁ, সাবধান!' এই কথা বলিয়া তরবারি সঞ্চালন করিলেন। ঈসা খাঁ তরবারির আঘাত ঢালে উড়াইয়া কৃতান্তের রসনার ন্যায় দীপ্ত অসি প্রতাপের স্কন্ধদেশে প্রহার করিলেন। প্রতাপ সে আঘাত কৌশলে ব্যর্থ করিলেন। দুইজন দুইজনকে মন্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তরবারি, ভল্ল, গদা, খঞ্জর নানা অস্ত্র উভয়ে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত অশ্বদ্বয়ের মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিলেন, "খাঁ সাহেব! এসো অশ্ব হতে নেমে দু'জনে মল্ল যুদ্ধ করি।" অতঃপর প্রতাপ ও ঈসা খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত



www.pathagar.com

হইলেন। দুই এক পেঁচ খেলিবার পরেই প্রতাপ বুঝিলেন, ঈসা খাঁ তাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তখন প্রতাপ সহসা পরিচ্ছদ অভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা ঈসা খাঁর বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, ঈসা খাঁ মুহূর্তে ছুরিকা মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন। ছুরির আঘাতে হস্ততল বিক্ষত হইয়া গেল। প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকতায় ঈসা খাঁ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় "বেইমান, কাফের" বলিয়া ভীষণ গর্জন করতঃ প্রতাপের কটিবন্ধনী আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপ শৃঙ্গচ্যুত বৃহৎ প্রস্তরখন্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া পুনরায় উঠিতে যাইতেছেন দেখিয়া ঈসা খাঁ সজোরে বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জ্বালাময় ভল্ল বক্ষলক্ষ্যে উদ্যত করিয়া বলিলেন, "বল, জাহান্নামী কাফের, স্বর্ণ কোথায়? নতুবা এই ভল্লাস্ত্রে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করব!" প্রতাপ বলিল, "আমি স্বর্ণময়ীর কোন সংবাদই অবগত নহি, অকারণে আমাকে বধ করো না।"

চতুর্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "কি? এখনও প্রবঞ্চনা? মারুন শয়তানকে।" ঈসা খাঁ এইবার বর্শা আরও দৃঢ়মুষ্টিতে উর্ধ্বে উঠাইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অশ্বের দাপটে চতুর্দিক শব্দায়মান করিয়া শ্বেত পতাকা হস্তে "থামুন! থামুন! বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নক্ষত্রগতিতে ঈসা খাঁর নিকটবর্তী হইলেন। ঈসা খাঁ সকলকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অশ্বারূঢ় ব্যক্তি ঈসা খাঁকে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন, "হুজুর! প্রকৃত অপরাধীকে আমি বন্ধন করে এনেছি। যশোহরপতি স্বর্ণকে হরণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে দন্ড প্রদান করবেন না।" ঈসা খাঁ আগন্তুকের সম্ভ্রান্ত এবং তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রতাপাদিত্যকে রাজবন্দীরূপে রক্ষা করিতে কর্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন।

সুচতুর পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই আগন্তুক মাহতাব খাঁ। প্রতাপের পরাজয়ে রাজা কেদার রায় পরম আনন্দে ও উল্লাসে ঈসা খাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। দুঃখ-দুর্ভাবনা-পীড়িত শ্রীপুরে আবার নব আনন্দ ও নবশ্রী ফিরিয়া আসিল। নহবতে নহবতে বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। নগরবাসীরা পত্র, পল্লব, লতা, পুষ্প, কদলী বৃক্ষ ও পতাকায় নগর সুশোভিত করিলেন। নানাস্থানে উচ্চ উচ্চ তোরণ নির্মিত ও গীতবাদ্য হইতে লাগিল। কেদার রায় বিপুল আড়ম্বরে ঈসা খাঁ ও তাঁহার সৈন্য-সামন্তকে ভোজ প্রদানের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে লোকজন ও বাহক যাইয়া মাহতাব খাঁর নৌকা হইতে আহত কাপালিক এবং বন্দী হেমদাকে লইয়া আসিল। পাল্কী করিয়া পরম সমাদরে অরুণাবতী ও স্বর্ণময়ীকে আনা হইল। স্বর্ণময়ীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি ঘৃণা ও ক্রোধে কাপালিক এবং হেমদাকে প্রহারে জর্জরিত করিল। আহত কাপালিক সেই প্রহারেই প্রাণত্যাগ করিল। হেমদাকে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য তাহার পিতা বরদাকান্ত এবং রাজা কেদার রায় ঈসা খাঁকে নিবেদন করিলেন। সভার সমস্ত লোক একবাক্যে "ইহাই পাপাত্মার উপযুক্ত শাস্তি" বলিয়া



www.pathagar.com

উঠিল। কিন্তু ঈসা খাঁ প্রাণদন্ডের সমর্থন না করিয়া হেমদার নাক-কান কাটিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সকলে তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইল। মিথ্যা ধারণার জন্য ঈসা খাঁ এবং কেদার রায় উভয়েই প্রতাপাদিত্যের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ঈসা খাঁ সরল ও পবিত্র অন্তকরণে প্রতাপাদিত্যের সহিত গলায় গলায় সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাকে বন্ধুতার চিহ্ন-স্বরূপ অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদত্ত হইল।

ঈসা খাঁর ধর্মগুরু মওলানা রেজাউল মোস্তফা বলিলেন যে, "পাপের দন্ড ভোগ অনিবার্য। কিন্তু পরকাল অপেক্ষা ইহকালে দন্ড ভোগ অনেক সুখের। মহারাজ! আপনি পূর্বে যে স্বর্ণময়ীকে হরণ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, সেই পাপের ফলে আপনার এই পরাজয়, লোকক্ষয়, ধনক্ষয়, অপযশ এবং লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। পাপের শাস্তি তখন তখন না হলে অনেকে মনে করে উহা পাপ নহে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। পাপ কঠোর শাস্তি প্রসবের জন্যই সময় গ্রহণ করে থাকে।"

অতপর ঈসা খাঁ অরুণাবতীর বিবাহের কথা পাড়িলেন। প্রতাপ সাশ্রু নেত্রে বলিলেন, "সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে পূর্বে হতেই অরুণাবতীর বিবাহ দিবার জন্য আমার সংকল্প ছিল। আমার দুর্মতিবশতঃই তার সহিত আমার বিরোধ ও শত্রুতা জন্মেছিল। কিন্তু তিনি আজ আমাকে আসন্ন মৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন। তাঁর উদারতা ও মহত্ত্বে আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁর ন্যায় মহানুভব এবং হৃদয়বান পরমোপকারী ব্যক্তির কাছে কন্যাদান করতে পারলে এক্ষণে আমি পরম সুখ ও গৌরব অনুভব করব। আমার অরুণাবতীর-রূপ মাধবীলতা উপযুক্ত সহকারকেই আশ্রয় করেছে।" অতঃপর প্রতাপাদিত্য বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া অরুণাবতীকে সঙ্গে লইয়া যশোহরে ফিরিয়া গেলেন।

মাহতাব খাঁ ঈসা খাঁর সৈন্যদলে চাকুরি গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকদিন পরে, গভীর দুঃখ এবং শোকের সহিত ঈসা খাঁ ও মাহতাব খাঁকে লিখিয়া জানাইলেন যে, বসন্ত রোগের আক্রমণে অরুণাবতী সহসা পরলোক গমন করিয়াছে। মাহতাব খাঁ এই দারুণ সংবাদে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। আশার জ্যোৎস্না চির আঁধারে ঢাকিয়া গেল। অরুণাবতীর যে অরুণিমাজাল তাহার হৃদয়ে আলোক-প্রবাহ ও আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সূচীভেদ্য অন্ধকারে পরিণত হইয়া অনন্ত বিষাদ ও অনন্ত শোকের প্রবাহ সৃষ্টি করিল। হায় প্রেম! হায় সুখ! তোমাদের আশা এমনি করিয়া মানুষের হৃদয় চিরকাল ভাঙ্গিতেছে, জ্বালাইতেছে এবং নিষ্পেষণ করিতেছে। তোমাদের দুইজনের মোহে এই বিশ্ব-সংসার মুগ্ধ হইয়া ছুটিতেছে। তাহার ফলে-নিরাশা, অবিশ্বাস, অপ্রাপ্তি; তাহার ফলে- শোক, দুঃখ, বিষাদ ও হাহাকারে বিশ্ব-সংসার পরিপূর্ণ হইতেছে। ঈসা খাঁ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। তিনি মাহতাব খাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিতে ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অন্য স্থানে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাহতাব খাঁ আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।



www.pathagar.com

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## তালিকোট যুদ্ধের সূচনা

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি স্বাধীন খন্ডরাজ্য ছিল। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে বিজয়নগর নামক সর্বপ্রধান রাজ্যটি হিন্দু রাজ্য এবং আহমদনগর, বিদর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা এই চারিটি মুসলমান রাজ্য ছিল। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা বরাবর মুসলমান-রাজা চতুষ্টয়ের সহিত মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া দিন দিন প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা সর্বদাই মুসলমানদিগের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং এই রাজ্যের হিন্দু -রাজত্ব লোপ করিবার জন্য নিত্য-জয়শীল কোনও মুসলমান বীরপুরুষ কদাপি উদ্যোগী হন নাই। কিছুকাল পর মুসলমান নরপাল চতুষ্টয়ের মধ্যে ভয়ানক গৃহ-বিবাদের সূচনা হইল। এই গৃহ-বিবাদের পরিণামে দাক্ষিণাত্যের সোলতানেরা পরস্পরের বল ক্ষয় করিয়া কথঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বিজাপুরের সোলতানের সহিত বিজয়নগরের রাম রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে পরিণত হয়। আহমদনগরের সোলতান রাম রায়ের পক্ষ অবলম্বন করতঃ বিজাপুরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন। বিজয়নগর এবং আহমদনগরের সম্মিলিত বিপুল বাহিনীর বীর্য প্রতাপে বিজাপুরের সোলতান শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। এই বিজয় লাভে এবং মুসলমান সোলতানগণের অনৈক্য দর্শনে রাম রায় নিতান্ত স্পর্ধিত, অহঙ্কৃত এবং মুসলমানের সর্বনাশ সাধনে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান ও ইসলামের আধিপত্য এবং প্রভাব নাশ করিবার জন্য বিপুল সমরোদ্যোগ করিতে থাকেন। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদিগের সাহায্যে একদল সুদক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য গঠন করেন। গোপনে তোপ-কামান ও বন্দুক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিজয়নগরাধিপ যে মুসলমান ধ্বংসের জন্য এরূপ দুরাকাঙ্খার বশীভূত হইবেন, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সোলতানেরা কদাপি তাহারা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা তখন ঘোরতর গৃহ-বিবাদে লিপ্ত। বিজয়নগরের বিপুলসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী, মুসলমানের চিরনির্বাসন ও সবংশে ধ্বংস কল্পনা করিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তাহাদের উন্মত্ততা পরিশেষে সংহারক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিজয়নগরের মুসলমান সংহারে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়নগরে নানাদেশীয় কয়েক সহস্র মুসলমান ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেন। একদা গভীর রাত্রিতে হিন্দুরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে থাকে। মুসলমানেরা সর্বত্র উৎপীড়িত এবং কিয়দংশ নিহত হইয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গাজীর বেশে সজ্জিত হন। মুসলমান রমণীরাও তরবারি হস্তে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। মুসলমানদিগের উদ্দীপ্ত তেজে হিন্দুরা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে দুর্গ হইতে দলে দলে



www.pathagar.com

সৈন্য আসিয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। সমস্ত নগরবাসী হিন্দু ও হিন্দুসৈন্যের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমান নরনারী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কতিপয় অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমান যুবতীকে বন্দী করিয়া কৃতঘ্ন রাম রায় তাহাদের সতীত্ব নাশে উদ্যত হন। যুবতীরা আত্মহত্যা করিয়া নরাধম পিশাচের হস্ত হইতে ধর্মরক্ষা করেন। অতঃপর মসজিদসমূহ চূর্ণ করিয়া তাহার স্তূপের উপর ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এখানে বলা আবশ্যক যে, স্বীয় রাজধানীর মুসলমানদিগকে প্রথমেই আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না। প্রথমতঃ সোলতানগণকে একে একে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে ঐসলামিক শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে ও পরে যাবতীয় মুসলমান হত্যা করাই তাঁহার অভীষ্ট ছিল। কিন্তু উন্মত্ত নাগরিক ও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদিগের উদ্দাম উত্তেজনায় প্রথমতঃ তাঁহার রাজধানীই মুসলমান-রক্তে রঞ্জিত হইল!

এই সংবাদ অত্যল্পকাল মধ্যেই মুসলমান রাজ্য চতুষ্টয়ে দাবানল শিখার ন্যায় প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ প্রথমে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকান্ডের বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে সত্যতা অবগত হইয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইলেন। অবশেষে রুদ্র মন্ত্রে জেহাদের অগ্নি-সঞ্চারিণী বাণী ঘোষিত হইল। সোলতান চতুষ্টয় মুহূর্ত মধ্যে গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া ইসলামের সম্মান ও আপনাদের মঙ্গলার্থে ভ্রাতৃভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া রাম রায়কে সমুচিত শিক্ষা প্রদান এবং বিজয়নগরে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রোথিতকরণ মানসে পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মোল্লা মৌলবিগণ সর্বত্র অগ্নিময়ী বক্তৃতায় প্রত্যেক সক্ষম ও সুস্থ মুসলমানকে তরবারি ধারণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাম রায় তাহার পরিণাম ভাবিয়া কম্পিত হইলেও অনন্যগতি হইয়া রাজকোষ নিঃশেষিত করতঃ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমানগণ আর্যাবর্তবাসী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে পত্রযোগে পবিত্র জেহাদের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই সময়ে বিজাপুরের শাহী দরবারে আলীম দাদ খাঁ নামক একজন আমীর বাস করিতেন। ইহার জন্মস্থান প্রাচীন নসিরাবাদ* জেলার ইউসুফশাহী পরগণার শেরমস্ত নামক পল্লীতে। ইহার পিতা একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। ঈসা খাঁর সহিত আলীম দাদ খাঁর বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে এক মাদ্রাসায় এক ওস্তাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভে আলীম দাদা খাঁ বিজাপুরে গমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে প্রতিভা বলে রাজ্য-পরিষদের পদে সমারূঢ় হন। আলীম দাদ খাঁ স্বীয় বাল্যবন্ধু প্রবল প্রতাপশালী স্বাধীন ভূঁইয়াকুল মণি ঈসা খাঁকে পরমানন্দে জেহাদে যোগদান করিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেনঃ

---

* আধুনিক ময়মনসিংহ



www.pathagar.com

প্রিয়তম সুহৃদ!

করুণাময় বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের মহিমা নিত্য জয়যুক্ত হউক। তাঁহার অনন্ত মঙ্গলকর আশীর্বাদের পূণ্য-বারিতে আপনি অভিষিক্ত হউন। আপনার মনুষ্যত্ব এবং ইসলাম-অনুরাগ, বসন্তের কুসুম বিকাশের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবী আমোদিত করুক। আপনার বীর্য ও সাহস, বর্ষা-বারিপুষ্ট কলনাদিনী খরগামিনী তটিনীর উচ্ছ্বাসিত প্রবাহের ন্যায় জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবাহিত হউক।

হে বন্ধু! মানব-জীবন বিদ্যুদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্তেই তাহার বিশ্বোজ্জ্বলকারিণী প্রতিভার তীব্র ছটায় জগৎকে উদ্ভাসিত ও চমকিত করিয়া থাকে, আপনিও তেমনি সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষের আশীর্বাদে আপনার কর্মোজ্জ্বল জীবনের ধর্ম প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করুন।

প্রাণাধিক সখে!

বিজয়নগরের বিশ্বাসঘাতক পিশাচপ্রকৃতির পাষন্ড রাজা রাম রায় এবং হিন্দুগণ, দাক্ষিণাত্য হইতে করুণাময় আল্লাহতালার আদিষ্ট ও অভিলাষিত পরম পবিত্র ইসলাম ও মুসলমানকে নেস্তনাবুদ ও বে-বুনিয়াদ করিবার জন্য ভীষণ ও ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের যাবতীয় মুসলমান নরনারী, বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে পাষন্ড ঈশ্বরদ্রোহী কাফেরদিগের হস্তে অতীব শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে। যাবতীয় মসজিদ চূণীকৃত এবং অপবিত্রিত হইয়াছে। খৃস্টানগণ জেরুজালেম অধিকার করিয়া মুসলমানদের প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণকর ভীষণ জুলুম ও হত্যাকান্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বিজয়নগরের মুসলমানের প্রতি সেইরূপ অত্যাচার হইয়াছে। কৃতঘ্ন রাম রায় ঐসলামিক সোলতানী শক্তি-তরু উৎপাটিত করিয়া ইসলাম ও মুসলমানকে নিরাশ্রয়, বিপন্ন ও ধ্বংস করিবার মানসে, বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিতেছে। আমরাও সকলে এই পাষান্ড কাফের এবং তাহার রাজ্য ও দর্প, ভগ্ন ও চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। সোলতান চতুষ্টয় সমস্ত মনোমালিন্য ভুলিয়া ইসলামের দুষমনকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অনেক মুসলমান রমণী এবং শাহজাদী পর্যন্ত অস্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাবতীয় মুসলমানের হৃদয় রণোচ্ছ্বাসে পূর্ণিমার সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জেহাদের চিত্তোন্মাদিনী গীতিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বর্ষার প্রভাব হ্রাস হইবা মাত্রই আমরা যুদ্ধে অগ্রসর হইব। আশা করি, এই পবিত্র জেহাদ উপলক্ষে আপনার বিজয়ী তরবারি কাফের শোণিতাসঞ্চনে দক্ষিণাত্যের ভূমি উর্বরা ও ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শনে আকাশ-মন্ডলকে প্রভাসিত করিবে। আপনার বীরবাহু বিজয়নগরের দুর্গ-শীর্ষে ইসলামের চন্দ্রকলা- শোভী বিজয়- কেতু উড্ডয়নে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। ইতি-

ভবদীয় প্রণয়াস্পদ সখা ও ভ্রাতা-

আকিঞ্চন আলিম দাদ।

শেখ ইয়াকুব নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই পত্র ও অন্যান্য কতিপয় মূল্যবান উপহার সহ দাক্ষিণাত্য হইতে খিজিরপুরে ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর নিকট প্রেরিত হইল।



www.pathagar.com

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## নিরাশা

প্রতাপের সহিত যুদ্ধের পরে কয়েক দিনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। ঈসা খাঁ ভাদ্র মাসের শেষে অনুরাগাতিশয্যে কেদার রায়ের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বর্ণময়ীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিতে চান, এ প্রস্তাবে কেদার রায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অমাত্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কুলগুরু এবং চাঁদ রায় সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিলেন। ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহের পাকাপাকি কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই বাগদত্তা কন্যাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করা অপেক্ষা মহাপাতক আর কি আছে? ইহা দ্বারা কুল অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইবে। এবম্বিধ নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া চাঁদ রায় এবং কুলগুরু যশোদানন্দ ঠাকুর কেদার রায়ের অমত করিয়া ফেলিলেন। আজকাল যেমন বিধবা-বিবাহ লইয়া হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দুই প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, তখন মুসলমানকে কন্যাদান সম্বন্ধে ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতদিগের মধ্যেও সেই প্রাকর দুই মত ছিল। মুসলমানকে কন্যাদানের পক্ষে একদল এবং অন্যদল ইহার বিপক্ষে। বলা বাহুল্য, পক্ষ অপেক্ষা, বিপক্ষেই পণ্ডিত সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

স্বর্ণময়ীর মাতা রাণী হিরন্ময়ীও সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে ঈসা খাঁর জননী আয়েশা খানম, স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কেদার রায়ের নিকট ঘটক পাঠাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত এবং ক্ষুণ্ণ হইলেন। ঈসা খাঁকে একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিলেন। স্বর্ণময়ীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ অমত, বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া সে কথাও গোপনে কেদার রায়কে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু গোপনে জানাইলেও ঈসা খাঁ অবিলম্বেই তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি আশায় নিরাশার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কেদার রায় কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় যথাকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার রায় ব্যতীত সকলেরই ঘোর আপত্তি, বিশেষতঃ পূর্বেই স্বর্ণের বিবাহের কথা ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেদার রায় সম্মতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার ঘটক আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

ঘটকের কথা শুনিয়া বীরপুরুষ ঈসা খাঁর স্ফীত বক্ষ যেন দমিয়া গেল।



www.pathagar.com

আলোকময় আনন্দকোলাহলপূর্ণ পৃথিবী যেন শ্মশানে পরিণত হইল। স্বর্ণময়ীর প্রেমের মোহিনী আশার কনককিরণ-রাগে তাঁহার যে চিত্ত বিচিত্র জলদ-কদম্ব শোভিত উষার আকাশের ন্যায় শোভিত ছিল, তাহা হতাশার কৃষ্ণ-মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিস্তৃত রাজ্য, অখন্ড প্রভুত্ব, প্রফুল্ল যৌবন, অগাধ ধন, যাহা এতদিন সুখ ও আনন্দের কারণ ছিল, এখন তাহা জীবন পথের কন্টক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঈসা খাঁ ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি কুক্ষণেই আমি স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করিয়া ছিলাম! আর কি কুক্ষণেই বা স্বর্ণময়ী আমাকে আত্মডালি দিয়া পত্র লিখিয়াছিল। স্বর্ণকে আমি নির্মম দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শেষে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিব? হায়! যে সরলা যুবতী আমাকে সম্পূর্ণ প্রাণের সহিত বসন্তের নবলতিকার ন্যায় জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব? বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহার জীবন-কুসুম যে অকালে বিশুষ্ক হইবে। হায়! আমিই বা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্বর্ণকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন? বাগদত্তা কন্যাকে কেদার রায়ই বা কি করিয়া পুনরায় অন্যত্র সমর্পণ করেন? হায়! স্বর্ণ আমাতে কেন মজিল? কি বিষম সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা করা মানব-বুদ্ধির অগম্য। হায়! হৃদয় যে এক মুহূর্তের জন্যও স্বর্ণকে ভুলিতে পারিতেছে না। স্বর্ণকে পাইব না, ইহা চিন্তা করিতে-কল্পনা করিতেও হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হায়! আমার স্বর্ণ! আমাতে উৎসৃষ্টপ্রাণা স্বর্ণ, আমাতে মুগ্ধ স্বর্ণ, আমার প্রেম-বারিদের আকাঙ্ক্ষিণী তৃষ্ণার্ত-চাতকী স্বর্ণ, সে অন্যের পানিপীড়ন করিবে, উঃ! এ-চিন্তা কী অসহ্য! কি মর্মন্তুদ!! কি ভীষণ!! হায়! আমি যদি স্বর্ণকে না পাই, তবে প্রেমের ব্যভিচার করিয়া এ-জীবনকে আর কলঙ্কিত করিব না। শুধু তাই কি? এ জীবন লইয়া সংসারে যে কি করিব, তাহাও ত খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি আশ্চার্য! যদি স্বর্ণকে না পাই তাহা হইলে সংসারে আমার আর কিছুই কার্য নাই-অনুরাগ নাই- প্রয়োজন নাই! কিন্তু যদি স্বর্ণকে পাই, তাহা হইলে এ-সংসারের যেন কতর্ব্যের শেষ নাই-অনুরাগের সীমা নাই-কর্মের ইতি নাই-আনন্দের ইয়ত্তা নাই। হায় যৌবন! হায় রমণীর সৌন্দর্য! হায় প্রেম! তোমাদের কি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি! কি অদ্ভুত প্রয়াস!! ধন্য প্রেম! তোমার প্রভাবে মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহে, শুষ্ক তরুতে কুসুম ফোটে, অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় হয়, হেমন্তে কোকিল গায়, অন্ধ নক্ষত্র দর্শন করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। তুমি বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে আনন্দ, নেত্রে জ্যোতি, শরীরে স্বাস্থ্য, কর্মে উৎসাহ, মস্তিষ্কে বুদ্ধি, মানসে কল্পনা। তুমি যেখানে, সেখানেই স্বর্গ! তোমার যেখানে অভাব, তাহাই নরক! তোমার প্রাপ্তিই জীবন, তোমার অভাবই মরণ!"

ঈসা খাঁ প্রেমাস্পদের প্রেম- সৌরভে চিরবঞ্চিত হইবার ক্ষোভে নিতান্ত বিমনায়মান-চিত্ত হইয়া পড়িলেন, চঞ্চল মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা



www.pathagar.com

করিলেন; কিন্তু পূর্বের শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ঠিক এই উদ্বেগ ও মানসিক অধৈর্যের মধ্যে আলীম দাদ খাঁনের জেহাদের নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া শেখ ইয়াকুব খিজিরপুরে উপস্থিত হইল। পত্রপাঠে ঈসা খাঁর সর্বশরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। কাপুরুষ শয়তান কাফেরের হস্তে মুসলমানের এতাদৃশ শোচনীয় ও নৃশংস হত্যাকান্ড পাঠে, তেজীয়ান পাঠান বীর ক্রোধে ও ক্ষোভে প্রজ্জ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জেহাদের উম্মাদনায় তাঁহার বীরহৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। হৃদয়বান পাঠান বীরের জ্বালাময় বিস্ফরিত নেত্রযুগল হইতে নিহত নরনারী ও বালক-বালিকাদিগের জন্য সহ-মর্মিতা এবং শোকের তরল মুক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। সে পূণ্য অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি ও চাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে আহবান করিয়া সেই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পত্র শ্রবণে সকলের চক্ষুতেই ভ্রাতৃ-শোকের এবং জাতীয় সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু উদগত হইল। এ জেহাদে যোগদান করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, সে-বিষয়ে সকলেই একমত প্রকাশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের একশত যুবক জেহাদের জন্য রণক্ষেত্রে যাইতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হইলেন। ঈসা খাঁ, মাহতাব খাঁকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যে রাখিয়া পবিত্র জেহাদে যোগদান করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে রাজ্য রক্ষা এবং রাজকার্য পরিচালনার সমস্ত বন্দোবস্ত করতঃ দুই সহস্র উৎকৃষ্ট রণদক্ষ যোদ্ধা লইয়া জলপথে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। একশত স্বেচ্ছাসেবক বীর যুবকও রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ঈসা খাঁর প্রেম-পিপাসিত হৃদয়ের নিদারুণ উদ্বেগ এবং স্বর্ণময়ী লাভের ব্যাকুল ও অবিরাম চিন্তা, জেহাদের উত্তেজনায় এবং জাতীয় সহানুভূতির উদ্দীপনায় যেন ঢাকা পড়িয়া গেল। ঈসা খাঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র কর্তব্যকে জাতীয় বৃহত্তর কর্তব্যের নিকট বলিদান করিলেন। নারী-প্রেম, জাতীয়-প্রেমের নিকট ডুবিয়া গেল। ধন্য ঈসা খাঁ। ধন্য তোমার জাতীয় প্রেম!! তুমি যথার্থ বীরপুরুষ!!



www.pathagar.com

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ
## শাহ্ মহীউদ্দীন কাশ্মীরী

শরতের সুপ্রভাত। নির্মল নীলাম্বরে বিশ্বলোচন সবিতা অরুণিমাজাল বিস্তার করিয়া ধরণী-বক্ষে নবজীবনের আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়া দিয়াছে। শ্যামল তরুপত্রে বালার্কের স্বর্ণকিরণ সম্পাতে এক চিত্ত-বিনোদন দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইচ্ছামতীর কাঁচ-স্বচ্ছ সলিলে বাল-সূর্যের হৈমকিরণ পড়িয়া সহস্র হীরক-দীপ্তি ভাঙ্গিতেছে। মৃদু সমীরণ ফুলের গন্ধ হরণ করিয়া পুষ্প-চয়নরতা কামিনীর অঞ্চল উড়াইয়া, অলক দোলাইয়া, নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি তুলিয়া এবং পত্র-পল্লব আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক হিল্লোল মানবের প্রাণে স্বাস্থ্য-শক্তি ঢালিয়া দিতেছে। প্রকৃতির চির-গায়ক সুকণ্ঠ বিহগকুল নানা তানলয়ে সুধাবর্ষী স্বরে মুক্ত প্রাণের মুক্ত আনন্দ কীর্তন করিতেছে। প্রেমিকা রমণীর চক্ষুর ন্যায় মনোহর নীলাকাশের প্রান্ত নানা বর্ণের মেঘমালা বহুরূপীর ন্যায় মুহুর্মুহু শরীর ও বর্ণ পরিবর্তন করিতেছে। প্রকৃতি যেন আজি নির্মল আনন্দপূর্ণ ও হাস্যময়ী।

আজ আশ্বিনের পঁচিশ তারিখ। দুর্গা পূজার ষষ্ঠী। বাঙ্গালার পাখী-ডাকা ছায়া-ঢাকা পল্লীর শান্ত শীতল বক্ষে আনন্দের স্রোত আজ শতধারায় প্রবাহিত। বালক-বালিকারা নানাপ্রকার রঙ্গীন বস্ত্রে বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ বা উদ্যানে মালঞ্চে, গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গণে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতেছে। গ্রামে গ্রামে জোড়-কাঠিতে ঢাক বাজিতেছে। প্রবল প্রতাপ রাজা কেদার রায়ের বাসস্থান শ্রীপুরে আজ আড়ম্বরের সীমা নাই। আজ কেদার রায়ের বাড়ীতে মহাসমারোহ। বাড়ীর উদ্যান সংলগ্ন প্রকান্ড মন্ডপ দালানে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশটি প্রকান্ড স্তম্ভের উপরে মন্দির সংস্থাপিত। কেদার রায়, বিজয়নগরনিবাসী একজন ইরানী মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা এই মন্দির গঠন করিয়াছেন। ইহা প্রাচীন ধরনের ভিতরে অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র দ্বারবিশিষ্ট মন্দিরের ন্যায় নহে। মসজিদের নিদর্শনে ইহা অনেকটা উন্নত আদর্শে প্রস্তুত। থামগুলি বেশ উচ্চ এবং দ্বার ও জানালা প্রশস্ত। এই মন্দিরেই শ্রী শ্রীমতী দুর্গাদেবীর সিংহ-বাহিনী দশভূজা প্রকান্ড মূর্তি, গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিক, স্বরস্বতী ও অসুরের সহিত প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত নাট-মন্দির। নাট-মন্দির বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত। উহাতে ঝাড়, ফানুস, লণ্ঠনের সঙ্গে সুপক্ক কলার কাঁদী ও রঙ্গীন কাগজের ফুলের ঝাড়ও ঝুলিতেছে। দিল্লীর চিত্রকরদের অঙ্কিত কয়েকখানি সুন্দর পটও সোনা-রূপার কাঠাম বা ফ্রেমে শোভা পাইতেছে। দলে দলে লোক পূজা-বাড়ীতে আসিতেছে ও যাইতেছে।



www.pathagar.com

নানা স্থান হইতে ভারেভারে ফলমূল তরিতরকারি অনবরত আসিতেছে। মন্দির দক্ষিণ-দ্বারী। মন্দিরের পূর্ব-পার্শ্বে একটি প্রকান্ড ফল-ফুলের বাগান। সেই বাগানের পূর্বে একটি ইষ্টক-মন্ডিত পথ। সে পথের নীচেই স্বচ্ছ-সলিলা ইচ্ছামতী কল্ কল্ করিয়া দিবারাত্রি আপন মনে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

নদীর ঘাট অনেক দূর পর্যন্ত সুন্দররূপে বাঁধান। নৌকাযোগে নানা স্থান হইতে নানা দ্রব্য আসিয়া ঘাটে পৌঁছিতেছে। আর ভারীরা তাহা ক্রমাগত ভুঁইয়া-বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতছে। ঘাটে কয়েকখানি পিনীস, বজরা ও ডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে। ঘাটে রাজবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাটীর বহু স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। এলায়িত-কেশা, সিক্ত-বস্ত্রা পদ্মমুখী শ্রীমতীদের মুখে বাল তপন তাহার কিরণ মাখাইয়া সৌন্দর্যের লহরী ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোন রমণী গ্রীবা হেলাইয়া দীর্ঘ কুন্তলরাশি সাজিমাটী ও খৈল-সংযোগে পরিস্কার করিতেছে। কোন নারী কাপড় ধুইতেছে। বালিকার দল পা নাচাইয়া জল ছিটাইয়া সাঁতার কাটিতেছে। যুবতীরা ঈষৎ ঘোমটা দিয়া আবক্ষ জলে নামিয়া শরীর মর্দন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে আড়চক্ষে সম্মুখ দিয়া নৌকায় কাহারা যাইতেছে, তাহা দেখিয়া লইতেছে। প্রবীণরা ঘাটে বসিয়া কেহ কেহ সূর্যপূজার মন্ত্র আওড়াইতেছে। কেহ কেহ পিতলের ঘটি ও কলসী মাজিয়া এমন ঝক্‌ঝকে করিতেছে যে, উহাতে সূর্যের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝল্‌মল করিয়া সোনার ন্যায় জ্বলিতেছে। হায়! মানুষ নিজের মনটি যদি এমনি করিয়া মাজিত, তাহা হইলে উহাতে বিশ্ব-সূর্য পরমেশ্বরের জ্যোতিঃপাতে কি অপূর্ব শোভাই না ধারণ করিত! মানুষ নিজের বাটী, এমন কি জুতা জোড়াটি যেমন পরিস্কার রাখে, মনকে তেমন রাখে না। অথচ মানুষই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।

কোন যুবতী স্নানান্তে কলসী কক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। ঘাটের দক্ষিণ-পার্শ্বে কতিপয় পুরুষও স্নান করিতেছিল। একটি প্রফুল্ল মূর্তি ব্রাহ্মণ পৈতা হাতে জড়াইয়া মন্ত্র জপ করিতেছে। তাহার পার্শ্বে ফুটন্ত গোলাপের মত একটি শিশু স্নানান্তে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে এবং এক দৃষ্টে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জপ, মন্ত্র-ভঙ্গী এবং জল ছিটান দেখিতেছে। বোধ হয়, তাহার কাছে এ সমস্তই অর্থশূন্য অথচ কৌতুকাবহ মনে হইতেছে। সে এক এক বার মনে মনে ভাবিতেছে যে, তাহার ঠাকুরদাদা জল লইয়া এক রকম খেলা করিতেছে! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখের গাম্ভীর্য বালকের ধারণা নষ্ট করিয়া দিতেছি। এ সংসারে গাম্ভীর্যের প্রভাবেই অনেক হাল্‌কা জিনিস গুরু এবং গুরু জিনিসও গাম্ভীর্যের অভাবেই হাল্‌কা হইয়া পড়ে।

শ্রীপুরের ঘাটে দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীর দিনে প্রাতঃকালে যখন এই প্রকার রমণীদিগের স্নানের হাট বসিয়াছে, সেই সময়ে একখানি সবুজবর্ণ অতি সুন্দর প্রকান্ড বজরা, একখানি পিনীস ও একখানি বৃহদাকারের ডিঙ্গিসহ আসিয়া ঘাটে ভিড়িল।



www.pathagar.com

বজরায় খুব বড় একটি ডঙ্কা ছিল। বজরা কূলে লাগিবামাত্রই একজন লোক সেই ডঙ্কা পিটিতে লাগিল। ডঙ্কার আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনেক বাড়ীতেই তখন পূজার ঢাক বাজিতেছিল। ডঙ্কার আওয়াজে ঢাকের শব্দ তলাইয়া গেল। ডঙ্কার তুমুল ধ্বনি শুনিয়া ছেলের দল এবং অনেক কৌতূহলী ব্যক্তি বজরার দিকে ছুটিল।

বজরার মধ্যে একটি প্রশস্ত কক্ষে একখানি ব্যাঘ্রচর্মাসনে এক তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দিব্যকান্তি দরবেশ বসিয়া তসবী জপিতেছিলেন। তাঁহার মুখমন্ডল জ্যোতির্ময়, গম্ভীর অথচ ঈষৎ হাস্যময় এবং প্রশান্ত। তাঁহার চেহারার লাবণ্য, দীপ্তি এবং প্রশান্ততা দেখিলেই তিনি যে একজন প্রতিভাশালী ধর্মপ্রাণ তেজস্বীপুরুষ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। তাঁহার গাত্রে অতিশুভ্র একটি সাধারণ পিরহান, তাহার উপরে একটি সদ্‌রিয়া এবং মাথায় শ্বেতবর্ণ পাগড়ী। পরিধানে পা'জামা। এই সামান্য বস্ত্রেই তাঁহাকে বেশ মানাইয়াছে। তাপসের বয়স পঞ্চাশের উপর নহে। তাঁহার সর্বাঙ্গের গঠন সুন্দর, দোহারা। মুখে অর্ধহস্ত পরিমিত দীর্ঘ মসৃণ কৃষ্ণশ্মশ্রু শোভা পাইতেছে। গ্রীবাদেশের চতুস্পার্শ্বে বাবরীগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুই পার্শ্বের জোল্‌ফ প্রভাত বায়ুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যেন দুইটি কালো সর্প দুইপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়া দোল খাইতেছে। যে আসিতেছে, সেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মস্তক নত করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ অগ্রসর হইতেও পারিতেছে না, পিছাইতেও পারিতেছে না। চঞ্চলমতি কলহপ্রিয় ছেলে- মেয়েরা, যাহারা মুহূর্ত পূর্বে ভীষণ কোলাহলে প্রভাত-আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারাও দরবেশের সম্মুখে চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে একটু সাড়া শব্দ নাই। তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কেহ তাকাইতেও পারিতেছে না। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য বজরা সংলগ্ন ডিঙ্গীতে যাইয়া একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মুখে ব্রাহ্মণ জানিতে পারিল যে, দরবেশের নাম শাহ্ সোলতান সুফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী। তিনি কাশ্মীরের কোনও রাজপুত্র। রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল শাস্ত্রালোচনা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতঃ ধর্ম-প্রচার উপলক্ষে কিয়দ্দিন হইল নিম্ন-বঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে দরবেশের জপ শেষ হইলে তিনি বালকদিগকে অতি মধুর স্বরে বজরার নিকটে আহবান করিয়া হাস্যমুখে নিতান্ত স্নেহের সহিত সকলের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক-বালিকারা তাঁহার মধুর আহবানে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। নৌকায় যথেষ্ট পরিমাণে মর্তমান-কলা ও মিঠাই ছিল। তিনি প্রত্যেক বালককে পাঁচটি করিয়া কলা ও পাঁচটি করিয়া সন্দেশ পরম স্নেহের সহিত দিতে লাগিলেন। বালকদের মধ্যে সন্দেশ লইতে প্রথমে অনেক ইতস্ততঃ করিলেও পরে আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিল। বালকেরা সকলেই হিন্দু। তন্মধ্যে ১৪/১৫ জন



www.pathagar.com

গৌড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান। শাহ্ সাহেব কদলী ও মিঠাই বন্টন করিয়া দিয়া সকলকেই খাইতে বলিলেন। তাহারা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেই বজ্‌রার দুই পার্শ্বে বসিয়া স্বচ্ছন্দে কলা ও সন্দেশ খাইতে লাগিল। সেই সময় অনেক হিন্দু পুরুষ ও রমণী দণ্ডায়মান হইয়া ভিড় করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। সকলেই যেন পুত্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া সেই মহাপুরুষের দেব-বাঞ্ছিত-মূর্তি ও বালকদের প্রতি জননী-সুলভ মমতা দর্শন করিতে লাগিল।

বালকদের মধ্যে একটি ছেলেকে রোগা দেখিয়া শাহ্ সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জ্বর হয় কি?" সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হুঁ"। দরবেশ সাহেব মনে মনে কি পড়িয়া ফুঁ দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "তোমার আর জ্বর হবে না।" বালক বলিল, "বিকালে আমার জ্বর আসবে। এ জ্বরে কোনও চিকিৎসায় ফল করে নাই।" দরবেশ বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! বিকালে একবার এসো, তোমার জ্বর আসে কি-না দেখা যাবে। তোমাদের বাড়ী কত দূরে?" বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিকটের একখানি গ্রামের উচ্চশীর্ষ তালগাছ দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে, আমাদের বাড়ীর তালগাছ দেখা যাচ্ছে।" একটি বালককে জ্বরের জন্য ফুৎকার দিতে দেখিয়া আর একটি বালক বলিল, "আমার একটি ছোট ভাই ক'মাস থেকে পেটের অসুখে ভুগ্‌ছে।" দরবেশ বলিলেন, "বাড়ী হতে মাটির একটি নূতন পাত্র নিয়ে এসো, আমি পানি পড়ে দিব। তোমার ছোট ভাই-এর অসুখ ভাল হয়ে যাবে।" নীলাম্বরী-পরিহিতা প্রফুল্লমুখী একটি বালিকা অনেকক্ষণ দরবেশের নিকট বসিয়া তাহার মুখের দিকে এতক্ষণ পর্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতিমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কখন দরবেশ মুখ ফিরাইবেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার দরবেশ মুখ ফিরাইলে সে তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বেশ একটু ভঙ্গিমার সহিত মুখ নাড়িয়া বলিল, "আমার আঙ্গুলটা কেটে গেছে, ব্যথা করছে।" দরবেশ সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "কেমন করে হাত কেটেছে?"

বালিকাঃ আমার পুতুলের ছেলের বিয়ের তরকারি কুট্‌তে গিয়ে কেটে গেছে।

দরবেশঃ তোমার পুতুলের ছেলে আছে? তার বিয়ে হয়েছে?

বালিকাঃ হ্যাঁ, আপনি দেখবেন?

দরবেশ সাহেব বালিকার মতলব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বিকালে নিয়ে এস, দেখব"-এই বলিয়া তিনি বালিকার আঙ্গুলে ফুৎকার দিয়া বলিলেন, "তোমার বেদনা সেরে গেছে।" বালিকা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আশ্চর্যের সহিত বলিল "কৈ! আর ত বেদনা করে না! বা! আপনার ফুঁতে বেদনা সেরে গেল।"

তখন স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষের রম্যোদ্যান বঙ্গভূমি, আজকালকার মত রেলের কল্যাণে নদনদীর স্রোত বন্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রিয় নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল না;



www.pathagar.com

তাই সেই বহুসংখ্যক বালক-বালিকার মধ্যে একটি মাত্র রুগ্ন বালক ছিল। বালক-বালিকারা সূফী সাহেবের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইল। যে সমস্ত বয়স্ক লোক দাঁড়াইয়াছিল, দরবেশ সাহেব তাহাদিগকে স্থানীয় নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। লোক-সংখ্যা কত, মুসলমান কত, কেদার রায় কেমন লোক, স্থানীয় আবহাওয়া কেমন, জিনিসপত্র কেমন পাওয়া যায়, লোকের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্মানুরাগ কেমন, কত সম্প্রদায়, কত জাতি, কি কি পূজা-পদ্ধতি চলিত আছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহারাও যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। কেবল কেদার রায় কেমন লোক, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সকলেই থতমত খাইয়া পরে বলিল, "ভাল লোক। অনেক লোক-লস্কর আছে, বাঙ্গালার নবাবের খাজনা দুই বৎসর হল বন্ধ করেছে।"

দরবেশ সাহেব প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারিলেন, স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। মৎস্য ও তরিতরকারি অপর্যাপ্ত। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। সাধারণতঃ লোক সকল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কেদার রায়ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায় সামান্য একটু বাঙ্গালা ও ফারসী জানেন। কেদার রায় অপেক্ষা চাঁদ রায় কম নিষ্ঠুর ও উদার প্রকৃতির। কেদার রায় গন্ডমূর্খ, হঠকারী এবং কূপমন্ডুকবৎ সংকীর্ণ-জ্ঞান বলিয়া নিজেকে সত্য সত্যই প্রতাপশালী, বিশেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা বলিয়াই মনে করেন। বাঙ্গালার নবাব দায়ূদ খাঁর পতনে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি খাজনা বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রজামন্ডলীর মধ্যে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে রাজছত্র ধারণ ও মুদ্রাঙ্কনে এখনও সাহসী হন নাই।

কেদার রায় ঈসা খাঁকে সম্মুখে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও হাত- জোড় করিয়া বাধ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধির পথে কন্টক স্বরূপ বিবেচনা করেন। ঈসা খাঁ ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতা উপকার ব্যতীত কেদার রায়ের কখনও অপকার করেন নাই। বলিতে গেলে ঈসা খাঁর বন্ধুভাবই তাঁহার রাজ্যরক্ষার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে। ঈসা খাঁ কেদার রায়ের হিতৈষী না হইলে, ভুলুয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত ফজল গাজীর তরবারি ও কামানের মুখে কোন দিন শ্রীপুর শ্রীশূন্য হইয়া যাইত। ঈসা খাঁর আনুকূল্যেই কেদার রায় অন্যান্য জমিদারের বহু এলাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দ্বি-প্রহরের প্রারম্ভে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, হজরত মহীউদ্দীন সাহেবের ভৃত্য, খাদেম ও শিষ্যগণ আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। শাহ্ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার অনুচর আটজন, বাবুর্চি একজন, খাদেম পাঁচজন এবং মাঝি-মাল্লা কুড়িজন, মোট চৌত্রিশ জন লোক ছিল। তিনি নিজের সম্পত্তি হইতে এ সমস্ত লোকের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কাহারও নিকট হইতে অর্থাদি কিছু লইতেন না। তবে



www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিলে, তিনি গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রায় বারমাসই রোজা রাখিতেন। রাত্রিতে সামান্য কিছু দুগ্ধ, রুটী ও ফল-মূল ভক্ষণ করিতেন। মৎস্য, মাংস স্পর্শও করিতেন না। সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও ধ্যান-ধারণায় রত থাকিতেন। ফজরের নামাজের পরে কোরান শরীফের এক-তৃতীয়াংশ আবৃত্তি করিতেন। তৎপর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সমাগত লোকদিগকে উপদেশ ও রোগীদিগকে পানি পড়িয়া দিতেন। তাঁহার পানি পড়ায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইতেছিল। তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই কবিরাজ ও হাকিমগণের অন্ন মারা যাইত। তাঁহার পানিপড়ার অদ্ভুত শক্তি দর্শনে লোকে আর কবিরাজ বা হাকিমের কাছে ঘেঁষিত না। দুই দিনের রাস্তা হইতে লোক আসিয়া পানি পড়াইয়া লইয়া যাইত, তিনি মধ্যাহ্নে জোহরের নামাজ পড়িয়া আসরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তিন ঘন্টা মাত্র ঘুমাইতেন। তাঁহার নিদ্রার এই এক আশ্চর্যত্ব ছিল যে, আসরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই তিনি জাগ্রত হইতেন। বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। আসরের নামাজ অন্তে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন দিন তিনি আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত ও গজলের চর্চা করিতেন। কোন কোন দিন গ্রন্থ রচনা করিতেন। তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা মাঠে বা নদীর ধারে ভ্রমণ করিতেন এবং সান্ধ্যোপাসনা মুক্ত আকাশের নীচেই প্রায় সম্পন্ন করিতেন। মগরেব বাদ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সমাগত লোক-জনদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার স্বর অতীব মিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং গম্ভীর ছিল। উপদেশে শ্রোতৃবর্গ তন্ময়চিত্ত হইয়া পড়িত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লোকজনের ভিড় কমিত না। মসলা-মসায়েল, ফতোয়া-ফারাজ এবং অধ্যাত্ম-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাকে শত শত লোকের প্রশ্নোত্তর দিতে হইত। তাহাতে তিনি বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মওলানা, মুন্‌শী, খোন্দকার ও মুফ্‌তিগণ তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতেন। সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লোকারণ্যের হলহলায় দিঙ্‌মন্ডল নিনাদিত হইত। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দস্তুরমত হাট-বাজার ও থাকিবার চটী বসিয়া যাইত। রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকজন বিদায় হইলে তিনি নৈশ-উপাসনা সমাপ্ত করিয়া ধ্যানস্ত হইতেন। ফজরের সময় এই ধ্যান ভঙ্গ হইত। ধ্যানের সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নির্গত হইত।

ফলতঃ শাহ্ মহীউদ্দীন একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্ব-প্রেমিক দরবেশ ছিলেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী ও সংস্কৃত এই চারিটি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সমগ্র কোরান, হাদিস, মস্‌নবী ও হাফেজ তাঁহার মুখস্ত ছিল। ইহা ছাড়া সংস্কৃত উপনিষদ, ষড়দর্শন ও গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের অগাধ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেন।



www.pathagar.com

ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্য এই চারি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা অভিব্যক্ত হইত। তাঁহার বজরাখানি আড়াই হাজারেরও উপর গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বশোষিকা-জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞান-চর্চার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং নিজে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াও রাজ-সিংহাসন কনিষ্ঠকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ মুসলমানের ন্যায় জ্ঞানপিপাসু, উদারপ্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বহিতৈষী পুরুষছিলেন।

নয় মাস কাল তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তিনি ৩৫ হাজার হিন্দুকে নানা প্রকারের ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবের কল্পিত বিশ্বাসের মসীমলিন অন্ধকার হইতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ আল্লাহ্‌তালার উপাসনা অর্চনায় দীক্ষা দিয়া মুসলমান সমাজভুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের টিকি কাটাইয়া, তিলক মুছাইয়া, গলার রসি খোলাইয়া, সভ্য-পরিচ্ছদ বিভূষিত করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরা যে মুসলমান ছিলেন, ইহা তিনি বেদ ও উপনিষদ্ হইতে প্রমাণ করিয়া হিন্দু পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। প্রাচীন আর্যজাতি যে সর্বাংশে মুসলমানদিগেরই ন্যায় একেশ্বরবাদী ও একজাতি ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা যে সাকার ও জড়োপাসনার বিরোধী, এমন কি তাঁহারা যে মুসলমানদিগেরই ন্যায় পরম উপাদেয় জ্ঞানে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন* এবং মৃতদেহগুলিকে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে চিতায় দগ্ধ না করিয়া পরম যত্নে গোর দিতেন, তাহা তিনি বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণ হইতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতেন। বিধবা-বিবাহের বহু ঘটনা ও শাস্ত্রীয় বাক্য প্রদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া দিতেন। আধুনিক হিন্দুগণ যে আদিম অসভ্য অনার্যজাতির সংস্রবে মৃৎ-প্রস্তর উপাসক এবং ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থমূলক কূট ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া শতধাবিচ্ছিন্ন, কুসংস্কার-সম্পন্ন এবং ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি এমন ভাবে চক্ষে আঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিতেন যে, স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণেরাও অশ্রুপাত করিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি দেব-দেবী যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় কবি-কল্পিত তাহা ব্রাহ্মণগণও শেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্রবণে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাতপা শাহ্ মহীউদ্দীন পাঁচ লক্ষ মুসলমানকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। শেরেক, বেদাত প্রভৃতি কুসংস্কার যাহা হিন্দু সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা সমূলে উৎপাটিত করেন।

---

* মূল রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, ভাবপ্রকাশ দেখে। অতিথি আসিলে গো-মাংস দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় অতিথির এক নাম 'গোঘ্ন'।



www.pathagar.com

তিনি দেশের নানা স্থানে বহু ইন্দারা ও দীঘিকা খনন করেন। শুধু তাহাই নহে, গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ, মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর সৎকার্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভায় সমাগত হিন্দু-মুসলমানকে প্রাগুক্ত সৎকার্যসমূহের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিতেন। শ্রোতৃমন্ডলী তাঁহার কথায় আনন্দের সহিত অর্থ দান করিত। এইরূপে নয় মাসে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই টাকা সমস্তই পূর্বোক্ত সদনুষ্ঠানসমূহে ব্যয় করিয়াছিলেন। মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় স্বহস্তে তিনি ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইঁদারা ও পুষ্করিণী খননে দশ কোদাল করিয়া মাটি অগ্রে নিজে উঠাইতেন। রাস্তা নির্মাণেও সর্বাগ্রে নিজে মাটি কারিয়া দিতেন। তাঁহার এই প্রকার প্রবল লোকহিতৈষণায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হিন্দুরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

তিনি প্রত্যহ অপর্যাপ্ত পরিমাণে যে সমস্ত ফল, মূল, চাল, ডাল, তরিতরকারি, মৎস্য, খাসী, মোরগ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও বস্ত্র উপহার পাইতেন, তাহা দীন-দুঃখী অনাথদিগকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বিতরণ করিতেন এবং কোন স্থান হইতে যাইবার পূর্বদিন মহাসমারোহপূর্বক সকলকে ভোজ দিতেন। ফলত, গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গের সমতলভূমিতে সহস্র শাখা বিস্তার পূর্বক সহস্র জল-প্রবাহে জমী উর্বরা করিয়া, মাঠে মাঠে সোনা ফলাইয়া, তৃষ্ণার জ্বালা দূরীভূত করিয়া, দেশের জঞ্জালজাল ভাসাইয়া লইয়া, পণ্য-পূর্ণ তরণী বহিয়া, বায়ুকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করিয়া, সমস্ত দেশে স্বাস্থ্য-শান্তি ও আনন্দ ছড়াইয়া কল্ কল্ নাদে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, মহাত্মা শাহ্ মহীউদ্দীন সাহেবও তেমনি প্রেম-পূণ্য সত্যের আলোক-উজ্জ্বল উদার হৃদয় ও বিশ্বহিত-কামনায় সৌরভ-পূর্ণ মন লইয়া কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার তরুচ্ছায়া-শীতল গ্রাম ও নগরে নবজীবন, নবআনন্দ ও নবপুলকের স্রোত গৃহে গৃহে প্রবাহিত করিতেছিলেন।



www.pathagar.com

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
## তালিকোটের যুদ্ধ

বর্ষান্তে শরতের প্রারম্ভে দিঙ্‌মন্ডল পরিষ্কৃত এবং ধরাতল সুগম হইলে, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলামানের মধ্যে সমর-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তালিকোটের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয় বাহিনী পরস্পর বিজিগীষু হইয়া সম্মুখীন হইল। আহমদ নগর, বিদর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সোলতানদিগের সৈন্যের সহিত নানাস্থান হইতে স্বজাতীয় হিতাভিলাষী ইসলামের গৌরবাকাঙ্খী যুবক যোদ্ধাগণ আসিয়া যোগদান করিলেন। বীরকুলচূড়ামণি সোলতান হোসেন নিজাম শাহ্ দেওয়ান মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা রাম রায় স্বকীয় সেনাদল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই ভীষণ সমরোদ্যমে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পর আক্রমণোদ্যত হইয়া অবস্থান করিবার পরে, একদা প্রত্যুষে একদল হিন্দু সৈন্য মুসলিম বাহিনীর এক অংশ আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের ফলে সেইদিন উভয় পক্ষে ভীষণ সমরঝটিকা প্রবাহিত হইল। মুসলমান সৈন্য জেহাদের নামে এবং হিন্দু সৈন্য রাজ্যরক্ষা-কল্পে মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়, হস্তী এবং বীরপুরুষদিগের পদভারে পৃথিবী কম্পিত হইল। তরবারির চাঞ্চল্যে, বর্শার দীপ্তিতে অসংখ্য বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে লাগিল। তোপের গর্জনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যগণ অসাধারণ রণ-কৌশল প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিবসের ভীষণ যুদ্ধেও কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণয় হইল না।

এইরূপ ক্রমাগত তিন দিবস ভীষণভাবে সমর চলিল। চতুর্থ দিবস, মোসলেম বাহিনী বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। গাজিগণ "আল্লাহ্ আক্‌বর" রবে মুহুর্মুহুঃ আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ বিক্রমে শত্রু-সৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

বৈশাখ-বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের ন্যায়, রণক্ষেত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সহস্র সহস্র হিন্দু সৈন্য আহত ও নিহত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন কালে মুসলমানের বীর্যপ্রতাপ রোধে অসমর্থ হইয়া হিন্দু সৈন্য পশ্চাতে হটিতে লাগিল। তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া একটি উচ্চাবচ ভূমিতে যাইয়া স্থির হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে বিজয়নগরের সৈন্যদল সে-স্থান হইতেও বিতাড়িত হইল। তৎপর দিবস বিজয়নগর হইতে বহু সংখ্যক নূতন তোপের আমদানি হওয়ায় হিন্দুসেনা সাহসী হইয়া তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পর্তুগীজ গোলান্দাজগণ



www.pathagar.com

অবিশ্রান্ত গোলা নিক্ষেপে মুসলমান পক্ষের বহু ক্ষতি সাধন করিল। হোসেন নিজাম শাহ্ ক্রোধে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া একদল যোদ্ধাকে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তোপের উপর পড়িয়া, তোপ কাড়িয়া লইতে বলিলেন। বঙ্গীয় পাঠান বীর ঈসা খাঁ তোপের উপর পড়িবার জন্য ৫০ জন আত্মোৎসর্গকারী বীরপুরুষকে আহবান করিলেন। তাঁহার আহবানে তাঁহার অধীনস্থ দুই সহস্র যোদ্ধার প্রত্যেকেই শহীদ হইবার জন্য লালায়িত হইয়া তোপ কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হইলেন। ঈসা খাঁ তাঁহাদের রণোন্মত্ততা দর্শনে অতিমাত্র উৎসাহিত হইলেন এবং সকলকে নিরস্ত্র করিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্য হইতে বিনাবিচারে পঞ্চাশজনকে গ্রহণপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে তোপ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। বাজ পক্ষী যত দ্রুত চটকের উপর বা নেকড়ে বাঘ যত সত্বর মেষপালের উপর উৎপতিত হয়, ঈসা খাঁ বাঙ্গালী যোদ্ধাগণকে লইয়া তদপেক্ষাও তীব্র বেগে, ভীষণ ঝটিকাবর্তের ন্যায় মুক্ত কৃপাণ করে "আল্লাহ্ আক্‌বর" রবে গোলন্দাজ সেনার উপরে পতিত হইলেন! গোলার আঘাতে ৪৩ জন সৈনিক এবং পঁয়ত্রিশটি অশ্বদেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সাতজন মাত্র বীর করাল কৃপাণ করে তোপখানার উপর পতিত হইয়া তরবারির ক্ষিপ্র প্রহারে তোপ-পরিচালক গোলন্দাজগণকে খন্ড খন্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তোপখানা রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে সৈন্যদল আসিয়া ভীষণ বিক্রমে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সপ্তজন মুসলমান গাজী রুদ্ধশ্বাসে চরম বিক্রমে তরবারি চালাইতে লাগিলেন। দুইজন বিশেষ আহত এবং অবশিষ্ট পাঁচজন শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যের ভীষণ আক্রমণরূপ নদীর প্রবাহকে গুরুতর বাধা প্রদান করিলেন। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলের সৈন্যগণ আসিয়া পড়ায় হিন্দু সেনা তোপখানা পরিত্যাগ করিয়া বৃকতাড়িত শৃগালের ন্যায় পশ্চাদগামী হইল। মুসলমান সেনা তখন তোপের মুখ ফিরাইয়া হিন্দু সেনাকে লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিল। চতুর্দিক বজ্রনির্ঘোষ-নিনাদিত বনভূমির ন্যায় ভীতিসঙ্কুল হইয়া উঠিল। তোপের গোলার অভাব হওয়ায় সোলতান নিজাম শাহ্ রাশি রাশি পয়সা পুরিয়া তোপ দাগিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে গোলা অপেক্ষা অধিকতর সুফল ফলিল। পয়সাগুলি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বহুসংখ্যক হিন্দু সেনা আহত এবং নিহত হইল। তাহার ফলে অবশিষ্ট সৈন্য-ব্যূহ ভগ্ন করিয়া নগরাভিমুখে পলায়নপর হইল। মোসলেম সেনা পলায়নপর হিন্দু সেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। হিন্দু সেনা নগরে প্রবেশ করিয়া নগরদ্বার রুদ্ধ করিল এবং নগর পরিবেষ্টন করিয়া যে পরিখা ছিল, তাহার সেতু তুলিয়া ফেলিল।

বিজয়নগরের চতুর্দিক সমুচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর এবং দুই শত হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ও


www.pathagar.com

বিশ হস্ত গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পরিখার গর্ভে নানাবিধ তীক্ষ্ণাগ্র শেল, শূল ও লৌহদন্ড প্রোথিত ছিল এবং প্রাচীরোপরি প্রস্তর নিক্ষেপের উপযোগী বহুসংখ্যক যন্ত্র ও তোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল। মুসলমান সৈন্য, নগরের সিংহদ্বারের নিকটবর্তী হইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য একস্থান লক্ষ্য করিয়া অনবরত তোপ দাগিতে লাগিল। বিজয়নগরের পক্ষে পর্তুগীজ গোলন্দাজগণও যথাযথ তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

পরিখা অতিক্রম করিতে না পারিলে নগর আক্রমণের বিশেষ সুবিধা নাই দেখিয়া নিজাম শাহ্ পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কৌশল ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক নৌকা নির্মাণপূর্বক পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। অবশেষে বহুসংখ্যক প্রকান্ড প্রকান্ড বৃক্ষ ও প্রস্তর নিক্ষেপপূর্বক সেতু নির্মাণের পরামর্শ স্থির হইল। তোপের আশ্রয়ে ঈসা খাঁ একদল ধর্মযোদ্ধা লইয়া সেতু রচনা করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের গোলা ও প্রস্তর নিক্ষেপে দলে দলে বীরপুরুষ হত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সে-দিকে আজ কাহারও দৃক্‌পাত নাই। অসংখ্য শবদেহে পরিখার গর্ভদেশের কিয়দংশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরিখার জল রক্তস্রোতে আরক্ত হইয়া উঠিল। বহু সাধনা এবং বহু প্রাণদানে সেতুর কতক অংশ নির্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রাচীরের উপরিস্থ তোপখানা হইতে অজস্রধারে অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলা ও প্রস্তর বর্ষণ হওয়ায় অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ঈসা খাঁ এই প্রতিবন্ধকতায় আরও উত্তেজিত হইয়া ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। বিংশতি হস্ত পরিমিত স্থান সেতু নির্মাণ হইতে অবশিষ্ট ছিল। ঈসা খাঁ জলদগম্ভীর স্বরে সৈন্যবৃন্দকে আহবান করিয়া বলিলেন, "কে আছ আজ ধর্মপ্রাণ খোদাভক্ত সাচ্চা মুসলমান! এখনি এই সেতু হইতে আমার পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়। সাঁতার কাটিয়া এই অংশ অতিক্রম করিয়া দ্বারের মূলদেশে যেয়ে দ্বার ভাঙ্গবার চেষ্টা কর।"-এই কথা বলিয়া পঠান-বীর উন্মত্তের ন্যায় পরিখার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সঙ্গে সহস্র সহস্র যোদ্ধা পরিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া আঁকশির সাহায্যে তীরে উঠিয়া দ্বারদেশ আক্রমণ করিলেন। সহস্রাধিক মুসলমান পরিখার জলগর্ভস্থ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রে এবং কামানের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঈসা খাঁ পরিখা অতিক্রমকালে বাহুতে একটা তীক্ষ্ণাগ্র বিষাক্ত শূলের সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রণোন্মত্ত অবস্থায় তিনি তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। ভীষণ বিস্ফোরক প্রয়োগে সিংহদ্বার চূরমার হইয়া গেল। তখন শাণিত কৃপাণ হস্তে 'দীন্ দীন্' রবে মুসলমান বীরগণ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সমর-কান্ড অতি প্রচন্ড এবং লোমহর্ষণ-জনকভাবে চলিল। নাগরিক সৈন্যবৃন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে আপনাদের বিক্রম নিঃশেষে একবার ভীষণ যুদ্ধোৎসাহ দেখাইল। কিন্তু উদ্বেলিত সাগর-প্রবাহের ন্যায় মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ-গতি রোধ



www.pathagar.com

করে কাহার সাধ্য? অসংখ্য পৌত্তলিক যোদ্ধার ছিন্নমস্তকে রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। মহাবীর সোলতান নিজাম শাহ্ বিশ্বাসঘাতক রাম রায়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে মৃতদেহপুঞ্জের মধ্যে আত্মলুক্কায়িত ভাবে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। তাঁহার এই আত্মগোপনের ভাবে সকলেই হাস্য ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আহত হিন্দু সৈন্যগণ রাম রায়কে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল। ঘৃণা ও লজ্জায় কাপুরুষ রাম রাজা সহসা মর্মে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

নগরবাসিগণ নিজাম শাহের আনুগত্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া পনের লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিলেন। নিজাম শাহ্ দুর্গশীর্ষ হইতে ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ স্বকীয় ঐসলামিক পতাকা প্রোথিত করিলেন। মোসলেম বীরগণ "আল্লাহ্ আকবর" রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এইরূপে তালিকোট যুদ্ধে বিজয় লাভান্তে বিজয়নগর অধিকৃত হইল। রাম রায়ের অদূরদর্শিতা এবং ঔদ্ধত্যের ফলে বিজয়নগর হিন্দু-শাসনের তামসী ছায়া হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ঐসলামিক সুশাসনের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল।

বিজয়নগরের বিজয় লাভের পরে মহাবীর ঈসা খাঁ দাক্ষিণাত্যের সোলতান ও প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইলেন। তিনি যে বাহুতে বিষাক্ত শূলের আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহারও চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হইল।



www.pathagar.com

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## কুলগুরু যশোদানন্দের ইসলামে দীক্ষা

শাহ্ সোলতান সূফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী শ্রীপুরে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরেই তাঁহার যশঃ-সৌরভে শ্রীপুর পূর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহার পবিত্র করস্পর্শে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে ধনী দরিদ্র বহু মুসলমান আসিয়া তাঁহার উপদেশ-রসামৃত পান করিয়া পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল। অনেক হিন্দুও তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী বক্তৃতা এবং কোরানের ব্যাখ্যা শ্রবণে ইসলামের পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়া আপনাদের জীবন পবিত্র করিল। ফলতঃ শ্রীপুরের রাজবাটীতে দুর্গোৎসব এবং শ্রীপুরের ঘাটে সূফী সাহেবের নিকট লোক-সমাগম ও দীক্ষার উৎসবে শ্রীপুর অহোরাত্র জন-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। হিন্দু ধর্মত্যাগী নব মুসলমানদের জন্য হিন্দু সমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল।

পূজার উৎসব শেষ হইলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। শ্রীপুরেশ্বরের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুরকে মুখপাত্র করিয়া সেই সভাস্থলে সূফী সাহেবকে আহবান করা হইল। সূফী সাহেবও বহু আলেম, ফাজেল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন। এই মহাসভার বিচার, বিতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে বিপুল জনতা আসিয়া সভাক্ষেত্র সমবেত হইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে সহস্রাধিক যোদ্ধা মুক্ত তরবারি করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত হইল। যথাসময়ে রাজা কেদার রায়ের আদেশে সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুর বেদের প্রশংসা কীর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম এবং সূফী সাহেবের অযথা কুৎসা কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং গৌরবের কথা কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া কেবল ইসলাম ধর্মের আক্রোশপূর্ণ কুৎসা কীর্তন করায় সমবেত হিন্দু-মুসলমান ভদ্রমন্ডলী সকলেই দুঃখিত হইলেন। মুসলমানগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সূফী সাহেব সকলকেই ধৈর্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আসরের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে পণ্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুর বিদ্বেষ-হলাহল উদ্গীরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সূফী সাহেবও সমবেত মুসলমানগণকে লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইলে সূফী সাহেব উচ্চৈঃস্বরে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" এই কলেমা সমস্ত মুসলমানকে লইয়া প্রমত্ত অবস্থায় পাঠ করিতে লাগিলেন। কলেমার ধ্বনিতে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। কলেমা পাঠ করিতে করিতে সূফী সাহেব উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বদনমন্ডল হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইল। তাঁহার প্রভাব এবং প্রতাপে সভাস্থল যেন প্রদীপ্ত এবং কম্পিত হইয়া



www.pathagar.com

উঠিল! তৎপর তিনি সভা মধ্যে সহসা দন্ডায়মান হইয়া পন্ডিত যশোদানন্দের দিকে তর্জনী তুলিয়া তিনবার গরুগম্ভীর মেঘমন্দ্রে বলিলেন, "হে যশোদানন্দা! তুমি সত্য গ্রহণ কর।"

শাহ্ সাহেব এইরূপ বলিবার পরে যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইল, তাহাতে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর যশোদানন্দ বেগে সভামধ্যে উত্থিত হইয়া গম্ভীর রবে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এই কলেমা অনবরত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞসূত্র আকর্ষণ করতঃ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন! অতঃপর পন্ডিতবর যশোদানন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে শাহ্ সূফী মহীউদ্দীন সাহেবের চরণতলে লুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণ আনন্দে "আল্লাহ আকবর" রবে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

যশোদানন্দ কাতর কন্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হজরত, আমাকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। ধর্মের আগুন আমার প্রাণের ভিতরে জ্বলে উঠেছে; আমার পাপ অন্তঃকরণ দগ্ধ হচ্ছে! আমি আর কাঠ-পাথরের পূজা করব না।" এই বলিয়া ঠাকুর দীক্ষিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ ও আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সূফী সাহেব তখন তাহাকে ক্ষৌর কার্য ও স্নান সম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই পন্ডিত যশোদানন্দ মস্তকের টিকি কাটিয়া নখ ও কেশাদি সংস্কার-পূর্বক স্নান করিয়া, সভ্যজনোচিত আচকান পায়জামা ও টুপী পরিয়া দিব্যমূর্তিতে সূফী সাহেবের চরণপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিলেন। সূফী সাহেব তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বিশ্বাসের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহার নাম জহিরুল হক রাখিলেন। মুসলমানগণ পুনরায় আনন্দোচ্ছ্বাসে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া "আল্লাহ আকবর" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজকুলগুরু সর্বজনমান্য মহাপন্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুরের ইসলাম গ্রহণে হিন্দুগণ হাহাকার করিতে লাগিল! রাজা কেদার রায় দুঃখে এবং লজ্জায় সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্নমনে প্রাসাদে ফিরিলেন।

পন্ডিত যশোদানন্দ ইসলাম গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরে, একদিন রাজা কেদার রায় তাঁহাকে পূর্ববৎ সমাদরে রাজ-দরবারে আহবান করিলেন। নবীন মুসলমান জহিরুল হক দুই চারিজন মুসলমান বন্ধুসহ রাজ-দরবারে আগমন করিলেন। রাজা সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্বক সহসা বন্দী করতঃ দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ জহিরুল হকের প্রতি বিষম অত্যাচার করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াফ্‌ত হইল।

জহিরুল হকের নিদারুণ লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনে কারাগৃহের পাষাণ-প্রাচীর এবং কক্ষতল অশ্রুজলে বিধৌত এবং আর্তনাদে শব্দায়মান হইতে লাগিল। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অতি নিভৃত কারাগারের সংবাদ বাহিরে কেহ অবগত না হইলেও, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ব্যাক্তিদিগের কাহারও জানিতে বাকী থাকিল না। যশোদানন্দের নির্যাতন এবং



www.pathagar.com

লাঞ্ছনায় সকলেই আনন্দিত হইল। অনেকের নিকট তাহা বৈঠকী গল্প, হাসি-ঠাট্টা এবং বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত হইল। কেবল করুণাময়ী স্বর্ণময়ীর কোমল প্রাণ যশোদানন্দের দুঃখে ব্যথিত হইল। স্বর্ণময়ী মধ্যে মধ্যে কারাগারের সম্মুখস্থ উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া লৌহ-দ্বারের গরাদের ভিতর দিয়া যশোদানন্দকে দেখিয়া আসিত। উদ্যানে কোন ফল পাইলে তাহাও প্রহরীকে বলিয়া গোপনে কুলগুরুকে দিয়া আসিত। যশোদানন্দ কারাগারের অসীম দুঃখ এবং নির্যাতনের মধ্যেও করুণাময় পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা এবং অর্চনা-আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়কে স্থির ধীর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা এবং গভীর ধর্মভাব দেখিয়া প্রহরীদিগের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল। হিন্দু থাকিতে যশোদানন্দকে তাহারা যেরূপ শ্রদ্ধা করিত, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও বেশী শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা যশোদানন্দের উপদেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিও গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর স্বর্ণ তাহাদের সহানুভূতি এবং সাহায্যে জহিরুল হকের খাদ্যের অসুবিধা দূর করিল। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্যজাত সরবরাহ করিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী জহিরুল হকের উদ্ধারের জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সহসা কোন নিরাপদ পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিল না। স্বর্ণ নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াও জহিরুল হক্‌কে মুক্ত করিবার জন্য প্রহরীকে অর্থলোভে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জহিরুল হক কিছুতেই সেরূপ ভাবে অন্যের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিতে রাজি হইলেন না।

অতঃপর স্বর্ণ সহসা একদিবস শিরঃপীড়ার ভান করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। কোনও রূপেই সে শিরোবেদনার লাঘব হইল না, বরং শিরঃপীড়ার সহিত নানা উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া স্বর্ণকে যার-পর-নাই ব্যথিত করিয়া তুলিল। কবিরাজ এবং হাকিমগণ স্বর্ণের এই আকস্মিক ব্যাধির কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বর্ণ একদিন শেষরাত্রিতে গভীর চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে শয্যায় উঠিয়া বসিল। স্বর্ণের জননী এবং পিতা সে-চীৎকারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, স্বর্ণ বলিল, "উপাস্য কালিকাদেবী এসে রোষ-কষায়িতনেত্রে গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন যে, 'তুই যদি বাঁচতে চাস, তাহলে তোর পিতাকে বলে কুলগুরুকে শীঘ্র মুক্তি করে দে। নতুবা এই অগ্নিময় মুখে তোকে গ্রাস করব।' এই বলে মুখব্যাদান করলেন, অমনি তাঁর মুখ হতে ভীষণ অগ্নিশিখা বহির্গত হতে লাগল। ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম।"

স্বর্ণময়ীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কেদার রায় তাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পরদিন প্রত্যূষেই জহিরুল হক্‌কে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। জহিরুল হক স্বর্ণের উপস্থিত-বুদ্ধি এবং অসাধারণ সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া পরমেশ্বরের সমীপে তাঁহার অজস্র মঙ্গল কামনা করিলেন। বলাবাহুল্য, সেইদিন দ্বিপ্রহর হইতে স্বর্ণময়ীর শিরঃপীড়া আরোগ্য হইল।



www.pathagar.com

# উনবিংশ পরিচ্ছেদ
## উৎকণ্ঠা

ঈসা খাঁ দাক্ষিণাত্যে জেহাদের জন্য গমন করিবার পরে স্বর্ণময়ী দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পিতার অসম্মতি প্রকাশে এবং ঈসা খাঁর জেহাদ গমনে তাহার চিত্ত বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হায়! সে যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদয়-মন সমর্পণ করিযা প্রেমদেবতা রূপে বরণ করিয়া অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে প্রীতির সিংহাসনে বসাইয়াছে-যাঁহার রাতুল চরণে আপনার সর্বস্ব বিকাইয়া বসিয়াছে-নেত্রে যাঁহার পরমরূপ সর্বদা দীপ্তি পাইতেছে-কর্ণে যাঁহার প্রীতিমাখা মধুরবাণী সর্বদা পীযূষধারা বর্ষণ করিতেছে-হৃদয়ের প্রতি অণুপরমাণু যাঁহার প্রেমসুধায় আকৃষ্ট এবং বিহ্বল, তাহার সেই সুখদ বসন্তের প্রাণ-জুড়ান, মন-মাতান মলয় সমীরণ, তাহার হৃদয়-আকাশের সেই শরচ্চন্দ্র, তাহার জীবন-মরুর সেই বর্ষণশীল-বারিদখন্ড, তাহার আতপদগ্ধ পথের সেই সুশীতল বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্তজীবনের সেই অমৃতনির্ঝরণী, জীবন-তরণীর সেই ধ্রুবতারা, মানসকুঞ্জের সেই বস্‌রাই গোলাপ, তাহার পিতার অসম্মতিতে এবং স্বীয় জননীর অমতে তাহাকে আদর করিয়া চরণতলে স্থান দিতে কি সমর্থ হইবেন? তাহাকে কি তিনি স্মরণ করিতেছেন? তিনি কি তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন? যদি না হন, কিংবা হায়! যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কি হইবে? হায়! আমি যাঁহার পদে জীবন-যৌবন ডালি দিয়া বসিয়াছি, তাঁহাকে আমি পাইব না! তাঁহার চরণে আমাকে সমর্পণ করা হইবে না। কিন্তু যাহাকে আমি জানি না-চিনি না-চাই না, আমাকে নাকি তাহার হস্তেই দেওয়া হইবে। বিধাতঃ! ইহাই যদি ধর্ম হয়, তবে আর অধর্ম কাহাকে বলে? ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহের কথা নাকি পাকাপাকি হইয়াছে, অথচ আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত অবগত নহি, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি হইতে পারে? হায়! হিন্দুজাতির বিচারে স্ত্রীলোকের আত্মা নাই!-বিচার নাই! নিজের সুখ-দুঃখ বোধ নাই! স্ত্রীলোক কি জড় পদার্থ কিংবা খেলার দ্রব্য যে তাহার রুচি, অনুরাগ ইচ্ছা এ-সমস্ত সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা হয় না-জিজ্ঞাসা করা হয় না। হা বিধাতঃ "এমন জাতিতে স্ত্রীলোক কেন জন্মে? যদি জন্মে তবে বাল্যেই মরে না কেন? যদি না মরে, তবে তাহার রুচি, অনুরাগ, বিচারশক্তি হরণ করা হয় না কেন?

থাক সে সব। এক্ষণে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব? হায়! কি কুক্ষণেই ঈসা খাঁর সেই চাঁদ বদন দর্শন করিয়াছিলাম। হায়! কিছুতেই যে সে মুখের শোভা, সে বিস্ফারিত আঁখির মধুময়ী দৃষ্টি, সে কণ্ঠের অমৃত-নিস্যন্দিনী-বাণী ভুলিতে পারি না।



www.pathagar.com

সে-হৃদয় যেন অফুরন্ত প্রেমপারাবার, তাহাতে ডুবিলে যেন সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সমস্ত আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। তাহাকে পাইলে আর কিছুই পাইতে বাকী থাকে না। তাঁহার কথা স্মরণে কত আনন্দ, কত উল্লাস। সে নাম স্মরণেও হৃদয়ের পরতে পরতে সুধা সঞ্চিত হয়! হা! তেমন সুন্দর, তেমন প্রিয়, আনন্দকর আর কে? এইরূপ দুশ্চিন্তায় রায়-নন্দিনী দিন যাপন করিতে লাগিল।

আশ্বিন মাস যাইয়া কার্তিক মাস যায়। স্বর্ণময়ীর বিবাহের জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসে ২৭শে তারিখে বিবাহ। রাজবাড়ীর দাস-দাসী, ভৃত্য, কর্মচারী, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখেই আনন্দ। সকলের মুখেই বিবাহের কথা। যতই বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, স্বর্ণ ততই নিদাঘ-তাপ-দগ্ধ গোলাপের ন্যায়, শুষ্ক এবং কদমে পতিত কমলের ন্যায় মলিন হইতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে, এ বিবাহ-পাশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল। ঈসা খাঁকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বরণ করিয়া বসাইয়া,-অন্যকে পাণিদান করিবে? না! না! তাহা কখনও হইবে না। এমন ব্যভিচার, এমন বিশ্বাসঘাতকতা, এমন অধর্ম কিছুতেই করিতে পারিবে না। তৎপরিবর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। স্বর্ণ ভীষণ দুর্ভাবনায় দিনদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইতে লাগিল। তাহার পিতা, ঈসা খাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পরে, ঈসা খাঁর মানসিক মতিগতি বা কি দাঁড়াইল, তাহাও জানিতে পারিল না। স্বর্ণের এই গভীর মনোবেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, সরলা নাম্নী একজন সখী ব্যতীত আর কেহই জানিত না। স্বর্ণ তাহাকে জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী জানিয়া প্রাণের কথা মর্ম-ব্যথা সমস্তই অকপটে তাহার নিকট প্রকাশ করিত।

সরলা তাহার বাল্য-সখী। শিশুকাল হইতে উভয়ের গভীর অনুরাগ। স্বর্ণের বিপদে, স্বর্ণের দুশ্চিন্তায় সরলাও ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। অবশেষে ঠাকুর যশোদানন্দ বা জহিরুল হকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্ণ সরলাকে কৌশল করিয়া পাঠাইয়া দিল। শাহ্ সোলতান মহীউদ্দীনের নিকট হইতে পানি-পড়া আনিবার উপলক্ষে সরলা জহিরুল হক্‌কে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

যশোদানন্দ সুকুমারী স্বর্ণময়ীকে বাল্যকাল হইতেই আপন কন্যার ন্যায় ভালোবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। কারাগারে যখন যশোদানন্দের নির্যাতন ও লাঞ্ছনায় তাঁহার পূর্বের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য-শিষ্যাগণ আনন্দবোধ করিতেছিল, তখন একমাত্র স্বর্ণের চক্ষেই তাঁহার জন্য সহমর্মিতার পবিত্র অশ্রুবিন্দু ফুটিয়াছিল। স্বর্ণ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই চঞ্চল চরণে করুণাপূর্ণ আঁখি ও মমতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া কিরূপ ব্যাকুলভাবে কারাগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কিরূপ পরিপূর্ণ সহৃদয়তার সহিত তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত এবং পরিশেষে তাহার বুদ্ধি-



www.pathagar.com

কৌশলে জহিরুল হক্ সেই সাক্ষাৎ নরক হইতে কিরূপে প্রমুক্ত হইলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের প্রাণের যন্ত্রণা এবং মহাবিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার স্নেহ-মমতা আরও উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। কোমলপ্রাণা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্বর্ণময়ীর সরল হৃদয়খানি প্রেমানুরাগে কিরূপে দগ্ধ হইতেছে- নৈরাশ্যের ভীষণ ঝটিকা, তাহার আশা-আনন্দ ও আলোকপূর্ণ মানস-তরণীকে কিরূপভাবে বিষাদের অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিতেছে, তাহা ভাবিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

স্বর্ণময়ী যে ঈসা খাঁর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, জহিরুল হক তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ঈসা খাঁর বিবাহ-প্রস্তাবে তিনি যদি আপত্তি উত্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণময়ীর জীবন-পূর্ণিমা আজ এমন অমবস্যায় পরিণত হইত না। তিনিই যে স্বর্ণময়ীর প্রণয়-পথে কন্টক রোপণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত এবং মর্মাহত হইলেন। এক্ষণে প্রাণপাত করিয়াও সে কন্টক উদ্ধার করিতে পারিলে, তিনি সুখী হইতে পারেন! স্বর্ণের ভবিষ্যৎ কি হইবে? কিরূপে ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত বিবাহ-সম্পর্ক ভঙ্গ করিয়া ঈসা খাঁর সহিত স্বর্ণময়ীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, তাহাই জহিরুল হকের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। স্বর্ণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলেই শ্রীনাথ চৌধুরীর পাপ-পাণিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ঈসা খাঁর জননী আয়েশা খানমের অমতে ঈসা খাঁর সহিত কিরূপে তাহাকে পরিণয়সূত্রে সম্মিলিত করা যাইবে, ইহাও এক গভীর সমস্যার বিষয়। অন্যদিকে স্বর্ণ মুসলমান হইলেই বা তাহাকে কোথায় আশ্রয় দেওয়া যাইবে? কেদার রায়ের রোষানলে দগ্ধিভূত হইতে কে স্বীকার করিবে!

জহিরুল হক্ স্বর্ণময়ী সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু মস্তিষ্ক-সিন্ধু আলোড়ন করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অধীর হইয়া তাঁহার ধর্মগুরু ধর্মাত্মা হজরত সূফী মহীউদ্দীন শাহের চরণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদরূপে বিবৃত করিলেন। শাহ্ সাহেব ক্ষণকালের জন্য নেত্র নির্মীলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর বলিলেন, "কয়েকদিন অপেক্ষা কর, কি করতে হবে জানতে পারবে।"



www.pathagar.com

# বিংশ পরিচ্ছেদ

## আত্মদান

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাংশ বিগতপ্রায়। স্বর্ণময়ীর বিবাহের আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট। শ্রীপুরের রাজবাটীতে বিবাহের জন্য বিশেষ সমারোহ ব্যাপার। স্বর্ণের উদ্বেগ ও অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। তাহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে, ভাবিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। স্বর্ণের তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক, বদনমণ্ডল মলিন। জহিরুল হক্‌ও বিশেষ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। তবে তাঁহার পীর মহাজ্ঞানী মহীউদ্দীন সাহেবের বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়াই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ বৃহস্পতিবার প্রাতে সুফী মহীউদ্দীন সাহেব জহিরুল হক্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "এখনি তুমি রায়-নন্দিনীকে লয়ে বিজয়নগরে যাত্রা কর। তথায় গেলেই তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

জহিরুল হক্ সুফী সাহেবের আদেশে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বিজয়নগর গমন কষ্টসাধ্য হইলেও, তথায় গমন করিলে সোনামণির অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই আশায় তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী, দুর্দিনের পরম বন্ধু সোনার মঙ্গল চিন্তায় জহিরুল হক্ ডুবিয়া গিয়াছিলেন; কাজেই তাহার সুখের জন্য যে কষ্ট স্বীকার, তাহা তাঁহার কাছে নূতন সুখের নিদান বলিয়াই বোধ হইল।

পরদিন নিশাশেষে উষার শুভ্র হাস্যরেখা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই জহিরুল হক্ স্বর্ণময়ীকে লইয়া ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে শ্রীপুর ত্যাগ করিলেন। জহিরুল হক্ দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকেও সঙ্গে লইলেন। স্বর্ণময়ী অশ্বারোহণে অনভ্যস্তা হইলেও কিছু দিনের মধ্যে অল্পে অল্পে কিঞ্চিৎ পটুতা লাভ করিল। জহিরুল হক্ সকল বিষয়েই পিতার ন্যায় স্বর্ণময়ীর যত্ন লইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী নানাদেশ ও জনপদ, অসংখ্য নদী ও মাঠ, নগর ও পল্লী অতিক্রম করিয়া উনত্রিশ দিনে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন।

ঈসা খাঁ তখন ঘোরতর পীড়িত। সেই বিষদিগ্ধ শল্যের আঘাতে তাঁহার বাহুর কিয়দংশ পচিয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শরীর শীর্ণ, কান্তি-শ্রী মলিন। সোলতান নিজাম শাহের খাস চিকিৎসক 'জোবদাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ্ খান সাহেব বিশেষ যত্নে তখন চিকিৎসা করিতেছিলেন। ক্ষতস্থানের পচনক্রিয়া কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। ক্ষত শুষ্ক না হওয়ার জন্য জ্বরও বন্ধ হইতেছে না। ঈসা খাঁর নিজের অনুচর ও ভৃত্যগণ এবং সোলতানের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। স্বয়ং সোলতান নিজাম শাহ্ প্রতি শুক্রবারে তাঁহাকে



www.pathagar.com

দেখিতে আসেন।

ঈসা খাঁর যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে স্বর্ণময়ী ও জহিরুল হক্ বিজয়নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাণপণে শুশ্রূষায় যোগদান করিলেন। ঈসা খাঁর শোচনীয় অবস্থা বিলোকনে স্বর্ণ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঈসা খাঁ তাঁহার রোগশয্যা-পার্শ্বে হৃদয়-প্রতিমা স্বর্ণকে অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তনীয়রূপে উপস্থিত দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের মুখ দেখিয়া ঈসা খাঁ প্রথমতঃ প্রফুল্ল, তৎপর তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন।

স্বর্ণ উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরেই আয়েশা খানমও অনুচর, সৈন্য ও ভৃত্যসহ পুত্রকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বিজয়নগরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ ঈসা খাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে মত দিলেন না। বিশেষতঃ সুদূর পথ অতিক্রমের নানা অসুবিধায় তাঁহার শরীর আরও দুর্বল হইতে এবং পীড়ার উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের সোলতান চতুষ্টয় নিজ নিজ প্রধান চিকিৎসকদিগের দ্বারা পরম আগ্রহে ঈসা খাঁর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। রাজচিকিৎসকগণ বহু চেষ্টায় জ্বর বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষত আরোগ্য হইল না। বরং জ্বর বন্ধ হইবার পরে ক্ষত কিছু বাড়িতে লাগিল। তাহাতে ঈসা খাঁ জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহু হইতে ছয় আঙ্গুলি দীর্ঘ এবং তিন আঙ্গুলি চওড়া স্থানে ক্ষত কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থলে যদি কোন সুস্থ এবং নির্দোষ-রক্ত যুবাব্যক্তির বাহুর সেই অংশ কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে।

'জোবদাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ্ খানের এ মত, অন্যান্য হাকিমগণের দ্বারা সমর্থিত হইলে, সোলতান নিজাম শাহ্ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদিগের মধ্য হইতে একজন সুস্থকায় যুবকের বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া ঈসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার জন্য আর এক ব্যক্তির প্রাণসংশয় ব্যাপার এবং ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে অনেক বুঝান হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জন্য কোন ব্যক্তির মাংসচ্ছেদ করিলে তিনি নিজের গলায় ছুরি লইবেন, ইহাও দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন। স্বর্ণ নিজ বাহু হইতে মাংস দিবার জন্য বিষম আকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। স্বর্ণ অনেক বুঝাইল, অনেক কাঁদিল, অবশেষে ঈসা খাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু ঈসা খাঁকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিল না।

স্বর্ণ বলিলঃ আপনার প্রাণই যদি রক্ষা না হয়, তা' হ'লে আমার প্রাণের জন্য



www.pathagar.com

কিছুই মমতা নাই। আপনার জীবনেই আমার জীবন। আমি প্রাণ দিয়েও আপনাকে রক্ষা করব। আপনি না বাঁচলে, আমিও বাঁচব না। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার জীবন রক্ষা করতে পারলেও সুখী হব। মাংস ছেদনে যে কষ্ট হবে, তা আমার সুখ এবং শান্তির কারণ হবে। আমাকে বেহুস করেও কাটতে হবে না। আমি নিজ হস্তে মাংস ছেদন করে দিব।

কিন্তু ঈসা খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্বর্ণ নিরুপায় হইয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ঈসা খাঁর প্রাণরক্ষার জন্য স্বর্ণের ব্যাকুলতা এবং কাতরতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঈসা খাঁর প্রতি স্বর্ণের স্বর্গীয় প্রেম এবং অপার্থিব অনুরাগ সন্দর্শনে সকলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িলেন। তাহার স্নিগ্ধ এবং সুন্দর মুখমন্ডলের পুণ্যশ্রী এবং উদার ও কাতরদৃষ্টিতে সকলেই তাহার দেব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। আয়েশা খানম পর্যন্ত স্বর্ণকে পরম যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের গুণে এবং অনুরাগে আয়েশা খানম এইরূপ মুগ্ধ এবং লুব্ধ হইয়া পড়িলেন যে, স্বর্ণকে তিনি পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে হাকিম আহমদুল্লাহ্ খান যখন ঈসা খাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁহাকে অন্যের মাংসচ্ছেদে মত দিবার জন্য বুঝাইতেছিলেন, স্বর্ণ সেই সময় হাকিম সাহেবকে ইঙ্গিতে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আপনি বীরবর খাঁ সাহেবের ক্ষতস্থান কেটে পরিস্কার করুন, আমি আপনাকে মাংস দিচ্ছি।" জোবদাতল হোকামা' স্বর্ণময়ীর দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ইঙ্গিতে অন্যান্য সহকারীদিগকে সত্ত্বর অস্ত্র-চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিতে বলিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইবার পরে সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিতভাবে দেখিলেন যে, একখানি শাণিত ছুরিকা দক্ষিণ হস্তে ধারণপূর্বক স্বর্ণময়ী অবিকম্পিত হস্তে শান্তভাবে অথচ ক্ষিপ্রতার সাহিত তাহার বাম বাহুর উপরিভাগের অংশে গভীরভাবে বসাইয়া দিয়া মাংস কাটিতে লাগিল। 'জোবদাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ্ খান মুহূর্ত মধ্যে ঈসা খাঁর ক্ষত কাটিয়া পরিস্কার করিলেন। অন্য একজন হাকিম 'জোবদাতল হোকামা' ইঙ্গিতে চকিতে স্বর্ণময়ীর বাহু হইতে মাংস লইয়া ঈসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে আর একজন অতি সত্ত্বর একটি হরিণের জানুদেশের উপরিভাগের মাংসচ্ছেদ-পূর্বক স্বর্ণের বাহুতে বসাইয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণের প্রলেপ দিয়া তাহার উপরে বরফ চাপিয়া ধরিলেন।

এত ক্ষিপ্রতার সহিত এবং নীরবে এই গুরুতর অস্ত্র-চিকিৎসার কার্য সম্পন্ন হইল যে, ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বাধা দিবার অবসর পর্যন্ত পাইলেন না। একবার তিনি "ওকি"। মাত্র বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সে শব্দ উচ্চারণের পূর্বেই স্বর্ণ তাহার বাহু হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত এবং



www.pathagar.com

এক অঙ্গুলি পরিমিত গভীর ক্ষতের জন্য স্বর্ণময়ীর মুখে কেহ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাইল না। সকলেই স্বর্ণের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আয়েশা খানম স্বর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্ত আশীর্বাদ ও গভীর স্নেহ জানাইয়া স্বর্ণের মুখ চুম্বন করিলেন। সোলতান নিজাম শাহ্ স্বর্ণের এই অতুলনীয় সৎসাহস এবং স্বার্থত্যাগ দর্শনে যার-পর-নাই প্রীত এবং মুগ্ধ হইলেন। প্রেমের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে সমগ্র বিজয়নগরবাসী নরনারী, -কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্বর্ণময়ীর পূণ্য-কথা যত্রতত্র আলোচিত হইতে লাগিল। রাজ-কবিগণ স্বর্ণময়ীর এই পূণ্য প্রেমাসক্তি স্বার্থত্যাগের কবিতা রচনা করিয়া শাহী-দরবারে এবং সভা-সমিতি ও সম্মিলনীতে পাঠ করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণকে দেখিবার জন্য বেগম ও শাহজাদী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণের গৃহে নানা শ্রেণীর অসংখ্য রমণীর সমাগম হইতে লাগিল। সোলতান ও বেগমগণ স্বর্ণময়ীকে ধর্মকন্যা বলিয়া সমাদর ও সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের সুচিকিৎসা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য সর্বপ্রকারের শাহীবন্দোবস্ত করা হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় অল্প দিনের মধ্যেই ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী আরোগ্য লাভ করিলেন।

ঈসা খাঁ রুগ্ন ও জীর্ণ দেহে আবার নবযৌবনের কান্তি-শ্রী ফিরিয়া আসিতে লাগিল। হিমানী-পীড়িত শ্রীহীন-উদ্যান যেমন বসন্ত-সমাগমে নবপত্র-পল্লব এবং ফল-ফুল মঞ্জুরীতে বিভূষিত হইয়া পিকবধূর আনন্দবিধান করে, ঈসা খাঁর স্বাস্থ্য-শ্রীও তেমনি স্বর্ণময়ীর প্রাণে অতুল আনন্দ দান করিতে লাগিল। জীবনের সার্থকতার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধে, জীবনানুভূতি স্বর্ণের নিকটে নিতান্তই সুবিধাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের দুঃখ-কষ্ট বা অসুবিধার বিষয় স্থান পাইতে পারে, এমন একটু স্থানও হৃদয়ে রহিল না। তাহার হৃদয়-মন্দিরের প্রেমদেবতা, অন্তর-আকাশের পূণ্যচন্দ্রমা, মন-উদ্যানের মন্দাকিনীধারা জীবনকুঞ্জের শোভন গোলাপ-ঈসা খাঁকে যে মৃত্যুর কবল হইতে নব-জীবনে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে, তাঁহার জন্য যে নিজ বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই মধুর ঘটনা ও উল্লাসে স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের কুঞ্জে অপার্থিব প্রেমের সুধা রাগিণীর যে বিনোদ ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় ভরপুর হইয়াছে। প্রেমাস্পদের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগের যে আনন্দ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। স্বর্গে সে আনন্দ নাই।



www.pathagar.com

# একবিংশ পরিচ্ছেদ
## মিলন

মাসাধিক কাল পরে বীরবর ঈসা খাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ ও পূর্ববৎ বলিষ্ঠ হইলেন। সোলতান নিজাম শাহ্ উৎফুল্লচিত্তে এক দরবার আহবান করিয়া ঈসা খাঁর স্বার্থত্যাগ, স্বজাতি-প্রেম এবং প্রখর বীরত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিয়া সোলতান চতুষ্টয়ের পক্ষ হইতে হীরকের মুষ্টিযুক্ত একখানি বহুমূল্য তরবারি, বহুমূল্য রাজকীয় পরিচ্ছদ, একটি অত্যদ্ভুত ঘটিকা-যন্ত্র, একছড়া বৃহদাকারের মুক্তার মালাসহ "বাবর-জঙ্গ"[১] উপাধি প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিজাম শাহের বেগম জান্নাত মহলের আগ্রহ এবং উদ্‌যোগে বিজয়নগরেই ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ীর বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া স্থিরীকৃত হইল। সোলতান নিজাম শাহ্ বিপুল উদ্যোগে বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উদ্বাহ-ক্রিয়ার জন্য বিরাট মহ্‌ফেল সংগঠিত হইল। রাজ্যময় ধূমধাম হৈচৈ পড়িয়া গেল। দশ হাজার লোক বসিতে পারে, এমন বিরাট সভামন্ডপ নির্মিত হইল। নানাশ্রেণীর দর্পণ, ময়ূরপুচ্ছ, পতাকা, ফুল ও পাতা দ্বারা মজলিস আরস্তা করা হইল। দশ সহস্র বেলওয়ার ও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বিচিত্র-দর্শন ঝাড় ও ফানুসের দ্বারা মজলিস রওশন করা হইল। অতিসূক্ষ্ম 'জড়বফ্‌ত' ও 'শবনম' দ্বারা দ্বারসমূহের যবনিকা প্রস্তুত করা হইল। কিঙ্খাপ দ্বারা চতুর্দিকের কানাৎ রচিত হইল। বহুসংখ্যক মূল্যবান 'ক্বালিন'[২] বিছাইয়া তদুপরি নানাশ্রেণীর চিত্র-বিচিত্র কুর্সী, সোফা ও তখ্‌ত স্থাপন করা হইল। নির্দিষ্ট দিনে বিপুল আড়ম্বরে শত তোপধ্বনি এবং অযুতকণ্ঠে মঙ্গল-কামনার মধ্যে ঈসা খাঁ এবং শামসুন্নেসার (স্বর্ণময়ীর ইসলামী নাম) শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর দুই দিন ধরিয়া নগরে সমস্ত হিন্দু ও মোসলেম অধিবাসী এবং সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে রাজ-ভোজে পরিতৃপ্ত করা হইল। বেগম জান্নাত মহল নব-দম্পতিকে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মনিমুক্তাখচিত অলঙ্কার এবং বহু জিনিসপত্র দান করিলেন। সোলতান চতুষ্টয় প্রত্যেকে একশত করিয়া পারস্য সাগরজাত মুক্তা এবং নিজ নিজ রাজ্যের একসহস্র করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা, একটি করিয়া আরব্য অশ্ব এবং একটি করিয়া হস্তী দান করিলেন। আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেহ মৃগনাভি, কেহ মুক্তা, কেহ সুবর্ণমুদ্রা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী যে পরিমাণ মুক্তা উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার ওজন ৩০২ তোলা হইয়াছিল।

---

১। বাবর-জঙ্গ-যুদ্ধের সিংহ। ২। ক্বালিন-গালিচা।



www.pathagar.com

বিবাহের পরে ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী দীন-দুঃখী এবং পান্থ ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে তিন দিন পর্যন্ত অর্থ বিতরণ করিলেন। এই বিতরণে এক লক্ষ সতর হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অতঃপর সোলতান, বেগম এবং আমীর ওমরাহ ও আলেমদিগকে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের টুপি, পাগড়ী, ছড়ি, তরবারি, পরিচ্ছদ, অঙ্গুরী প্রভৃতি উপহার প্রদানকরেন।

অতঃপর ঈসা খাঁ বিজয়নগরে স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ একটি করিয়া অনাথ আশ্রম এবং শামসুন্নেসা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে একটি রমণীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া মাঘ মাসের শেষে স্বদেশ প্রত্যাগমনে উদ্যোগী হইলেন।

সোলতানগণ আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ গভীর সহানুভূতি, ভ্রাতৃভাব এবং প্রগাঢ় প্রেমের সহিত সাশ্রুনেত্রে বিদায় প্রদান করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের মঙ্গলধ্বনির মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঈসা খাঁ তিন দিবস অশ্বারোহণে যাইবার পরে কৃষ্ণা-নদীর কূলে জাহাজে যাইয়া আরোহণ করিলেন। জাহাজ ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে তীরস্থ জনগণ রুমাল উড়াইয়া "জাজাকাল্লাহ্" "জাজাকাল্লাহ্"[৩] বলিয়া উচ্চকণ্ঠে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ ও তীরস্থ ব্যক্তিবৃন্দ রুমাল উড়াইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণা-নদী বহিয়া জাহাজ পাঁচ দিনে সমুদ্রে যাইয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর পনের দিন পরে জাহাজ উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে যাইয়া উপনীত হইল।

একদা প্রাতঃকালে উড়িষ্যার উপকূলে চিল্কাহ্রদের তীরে শিকার করিবার মানসে বীরপুরুষ ঈসা খাঁ কতিপয় শিকারী যোদ্ধাসহ ক্ষুদ্র তরণীযোগে জাহাজ হইতে তটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যখন চিল্কার তট-প্রদেশে নানা জাতীয় হংস, সারস ও চক্রবাক শ্রেণীর পক্ষী শিকার করিয়া হরিণ শিকারের জন্য চিল্কার পশ্চিমদিকস্থ কাননাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে একস্থানে চিল্কার তীরে বহু লোকসমাগম এবং বাদ্যধ্বনি ঈসা খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঈসা খাঁ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, একটি হিন্দু-রমণীকে তাহার মৃতপতির চিতায় একসঙ্গে পোড়াইবার জন্য এই সমারোহ ব্যাপারের সূচনা। ঈসা খাঁ নিজ রাজ্যের সহমরণ প্রথা কঠোর রাজাদেশ প্রচার করিয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য সহমরণ প্রথা যে কিরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কান্ড, তাহা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পান নাই। ঈসা খাঁ এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অশ্ব ছুটাইয়া যাইয়া জনতার নিতান্ত সন্নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি পরামাসুন্দরী যুবতী রমণীকে হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় তাহার স্বামীর চিতায় তুলিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে। নারীটি অতি করুণ কণ্ঠে আর্তধ্বনি করিতেছে। এদিকে

---

৩। জাজাকাল্লাহ্-আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।



www.pathagar.com

নারীহত্যার উদ্যোগী পাষণ্ডগণ সেই করুণ ক্রন্দনরোলকে কোলাহলে ডুবাইয়া দিবার জন্য বিপুল উদ্যমে বাজনা বাজাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রমণী ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণরক্ষা সঙ্কল্পে অন্তিম চেষ্টায় চরম বল-প্রয়োগে চিতা হইতে মাটিতে পড়িবার চেষ্টা করা মাত্র একটি পাষণ্ড হিন্দু ভীমবংশদণ্ড দ্বারা নারীর কটিদেশে আঘাত করিল। ঈসা খাঁ মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং যার-পর-নাই শোকসন্তপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি কর! কি কর!!" ঈসা খাঁর সঙ্গীয় যোদ্ধাগণও মুহূর্তমধ্যে ঈসা খাঁর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিন্দুগণ ঈসা খাঁকে মুসলমান, সুতরাং সহমরণের নিষ্ঠুর প্রথার তীব্র বিরোধী মনে করিয়া বংশদণ্ড, কুঠার, দা, লগুড় ও পাথর হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ইহাতে ঈসা খাঁ নিতান্ত উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমবেগে তরবারি হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকজন আহত হইয়া ভূপতিত হইবার পরেই সকলে বৃকতাড়িত মেষবৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। ঈসা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে যাইয়া চিতার উপর হইতে নারীকে স্বহস্তে উঠাইয়া লইলেন। তৎপর তাহার হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

রমণী বন্ধনমুক্ত ভক্তিভরে তাহার জীবনদাতা ঈসা খাঁর পাদস্পর্শ করিতে করিতে বাষ্পবারুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি অরুণাবতী।" বহুদিনের মৃতব্যক্তিকে সহসা জীবিতাবস্থায় দর্শন করিলে যে পরিমাণ বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতে পারে, সেই প্রকার বিপুল বিস্ময় ও কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হইয়া ঈসা খাঁ বলিলেন যে, "কি অরুণাবতী! আশ্চার্য! আশ্চার্য! সেকি কথা!! তুমি ত অনেক দিন হল বসন্তরোগে মারা গিয়াছ! তুমি এখানে কিরূপে? তুমি কোন্ অরুণাবতী? আমি তোমাকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যারূপেই দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি অন্য কোনও অরুণাবতী। শীঘ্র তোমার পরিচয় দাও।"

অরুণাবতী বলিল, "জাঁহাপনা, আমি যশোহরের অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীই বটে; আমি মাহতাব খাঁর বাগদত্তা ভার্যা। আমি বসন্তরোগে মারা যাই নাই। আমার বসন্ত হবার কথাটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। পিতা আমাকে মাহতাব খাঁর সাথে পূর্বে বিয়ে দিতে স্বীকৃত হলেও পরে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার জন্য এবং স্বর্ণময়ীকে হস্তগত করতে না পারায় আপনাদের প্রতি যার-পর-নাই জাতক্রোধ হন। মাহতাব খাঁর প্রতি তিনি যার-পর-নাই রুষ্ট এবং বিরক্ত। তাঁহার প্রাণ বধের জন্য তিনি নিতান্তই অধীর ও উন্মত্ত। শুধু দায়ে পড়েই তিনি মাহতাব খাঁর হস্তে আমাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। আমাকে বাটীতে লয়ে যাবার কয়েক দিন পরেই আমাকে একটি বিশেষ ঘরে আবদ্ধ করে, চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে দিলেন যে, আমি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছি। পরে অন্য একটি রমণীকে বাটী হতে রাজ-আড়ম্বরে শ্মশানে লয়ে দাহ করা হয়। তা'তেই আপনি ভ্রমে পড়েছেন। বস্তুতঃ আমি মারা যাই নাই। পিতৃদেব আপনাদের হস্ত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আমাকে মেরে ফেলবার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু আমার জননী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে অবশেষে বীরেন্দ্রকিশোর দত্ত নামক জনৈক নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তানের সহিত আমাকে বলপূর্বক



www.pathagar.com

বিবাহ দিয়া লোকজনসহ জগন্নাথধামে অতি সঙ্গোপনে পাঠিয়ে দেন। আমাদের জন্য বার্ষিক পাঁচ সহস্র মুদ্রার বৃত্তি বন্দোবস্ত করে দেন। নগদ দশ হাজার টাকা আমাদিগের বাটী ও সরঞ্জামী খরচের জন্য সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমি সমস্ত পথই অশ্রুপাত করতে করতে জগন্নাথক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হই। স্থলপথে এবং জলপথে ২০ দিনে আমরা পুরীতে এসে হাজির হই।

পুরী যাবার পঞ্চম দিবসে বীরেন্দ্র দত্ত অশ্বারোহণে নির্বিঘ্নে যেতে ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক অরণ্যের অন্তর্বর্তী পন্থায় সহসা ব্যাঘ্র-দর্শনে অশ্বটি উধাও হয়ে তাঁকে পৃষ্ঠ হতে ফেলে দিয়ে ছুটে পলায়ন করে। একখন্ড প্রস্তরের উপর মস্তক ও কটিদেশ পতিত হওয়ায় তিনি অতি সাংঘাতিক রূপে আহত হন। সেই আঘাতে তিনি যার-পর-নাই দুর্বল এবং পীড়িত হয়ে পড়েন। অনবরত কয়েক দিন রক্তবমন করেন। পুরীতে এসে হাকিম ইক্‌বাল খাঁর চিকিৎসায় অনেকটা আরোগ্য লাভ করেন। তৎপর হাকিমের উপদেশে চিল্কাহ্রদের তীরবর্তী মুন্ডী নামক স্থানের জলবায়ু উৎকৃষ্টতর বলে সেইখানেই আমরা বাস করতে থাকি। কিন্তু মুন্ডীতে এসে বীরেন্দ্র দত্ত কারও কথা না শুনে হাকিমী ঔষধ সেবন পরিত্যাগপূর্বক ময়ূরভঞ্জের জনৈক অবধূত সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করতে থাকেন। তাতে প্রথমঃ একটু ভালো ফল দেখা যায়। কিন্তু কয়েক দিন পরেই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর, ঠিক নয় দিবস পরেই গত রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে আমি পলায়ন করে কোনওরূপে আমার একমাত্র স্বামী-যাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নাই, যাঁকে স্বেচ্ছায় আমি হৃদয়-মন্দিরের সিংহাসনে প্রেম-রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতিরূপে বরণ করে নিয়েছি- সেই মাহতাব খাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় ও শান্তি লাভের সুবিধা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গের লোকজন আমার গহনাপত্র, মণিমুক্তা এবং অর্থলাভের জন্য বলপূর্বক সহমরণে বাধ্য করে। আমার অনুনয়-বিনয় এবং কাতর ক্রন্দন কিছুতেই তাদের পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না। আমি যখন স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হলাম না, তখন বলপূর্বক হস্তপদ বন্ধন করে আমাকে চিতায় তুলে দিল। আমি যখন করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলাম, তখন পাষন্ডগণ বিকট শব্দে ঢাকঢোল করতাল বাজাতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করতে লাগল। তার পর সর্ববিপদ্‌হন্তা মঙ্গলময় আল্লাহর কৃপায় আপনি এসে উদ্ধার করলেন।।"

ঈসা খাঁ অরুণাবতীর মুখে স্বপ্নরাজ্যের অগোচর এবং চিন্তার অতীত অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুক্তকণ্ঠে "ছোবহান আল্লাহ্!" "ছোবহান আল্লাহ্!" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রুর উন্মেষ হইল। অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখছি করুণাময় বিধাতা একনিষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকাদিগকে কদাপি বঞ্চিত করেন না।

এক্ষণে চল, আমার সঙ্গে চল। আমি দাক্ষিণাত্য হতে দেশে ফিরছি। মাহতাব খাঁ তোমার মিথ্যা-প্রচারিত মৃত্যু-সংবাদে মরমে মরে আছে। সে আবার তোমার অপ্রত্যাশিত দর্শনে রাহুমুক্ত মাহতাবের (চন্দ্রের) ন্যায় নব জীবন লাভ করবে। তোমার বাসনাও সিদ্ধ হবে। চল, আর বিলম্ব না করে জাহাজে চল। এথায় কালবিলম্বে অনেক বিপদ ঘটতে পারে।"

অতঃপর অরুণাবতীকে লইয়া ঈসা খাঁ 'বাবরজঙ্গ' জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন।

শেষ

www.pathagar.com

# শিরাজী ও রায় নন্দিনী

## ১.

আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় মনীষী ব্যক্তিত্বের মধ্যে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠার এবং উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শূন্যতা ও ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষার্ধে যে পুনর্জাগরণপ্রয়াস সূচিত হয় শিরাজী সে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জন্ম সিরাজগঞ্জে। তার জন্ম সাল ও দিন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। কবি গবেষক আবদুল কাদির শিরাজীর জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৫ আগস্ট বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর একমাত্র জীবনীকার এম, সেরাজুল হক ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই শিরাজীর জন্ম বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর মাজারে জন্ম তারিখ ১৫ জুলাই ১৮৮০ বলে উল্লেখ আছে। তিনি ১৯৩১ সালের ৩১ জুলাই ইন্তেকাল করেন। এ তারিখ সম্পর্কে অবশ্য কোন মতভেদ নেই।

যাহোক, দীর্ঘ ৫১ বছরের জীবনে শিরাজীর সাহিত্য ও কর্মজীবনের পরিধি ৩১ বছর। ১৯০০ সালে 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর কার্যকর সাহিত্য ও কর্মজীবন শুরু হয় বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

এই স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য ও কর্মজীবনে শিরাজী একটি লক্ষ্যে জীবন-সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তা হলো মুসলিম জাগরণ। শিক্ষাহীন, সাহিত্যচর্চায় পশ্চাৎপদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনাগ্রহী, নানা কু-সংস্কারের বাঁধনে অবদ্ধ নিস্তেজ মুসলিম সমাজে প্রাণ সঞ্চার করে তাদেরকে জাগিয়ে তোলা, স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড় করানোর জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য তিনি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন ইসলামের শাশ্বত আদর্শ, অতীত ইতিহাস এবং গৌরবের উজ্জ্বল বর্ণছটা। এজন্যে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সঙ্গীত রচনা করেছেন, ছুটে গিয়েছেন সুদূর তুরস্কে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে। ধর্মপ্রচারক, রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, যোদ্ধা, বাগ্মী প্রভৃতি বহুবিধ ভূমিকা তিনি একাই পালন করেছেন। আজকের স্বাধীন দেশের স্বাধীন মাটিতে বসে এ প্রজন্মের পক্ষে শিরাজী এবং তাঁর



www.pathagar.com

সহকর্মীদের ভূমিকা অনুধাবন করা সত্যই কঠিন। তাঁদেরকে জানতে হলে ইতিহাস জানতে হবে। সে ইতিহাস জাতীয় স্বার্থেই আমাদের জানা প্রয়োজন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সাহিত্যকর্মের অন্যতম প্রধান অংশ তার উপন্যাস। এ উপন্যাস রচনার জন্য তিনি সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। হিন্দু সমাজের কাছে শিরাজীর সাহিত্য একারণে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বহু মুসলমান সমালোচক শিরাজীর উপন্যাসকে উপক্ষো করেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন আজও হয়নি। শিরাজীর রচনাবলী বা কোন গ্রন্থই আর আজ বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এ শতকেরই মানুষ তিনি। কালের ইতিহাসে হারিয়ে যাবার মত পুরনো তিনি নন।

## ২.

সৈদয় ইসমাইল হোসেন শিরাজী তার সাহিত্যিক জীবনে সর্বমোট ৪টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করেন। এগুলো হলো 'রায়নন্দিনী' (১৩২২), 'তারাবাঈ' (?), 'ফিরোজা বেগম' (১৯১৮) ও 'নূরউদ্দিন' (১৩২৬)। তবে তথ্য প্রমাণে দেখা যায়, ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম প্রচারক' মাসিক পত্রিকায় বঙ্গবিজেতা তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা ও বিহারে বিজয় অভিযান অবলম্বনে শিরাজী 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' নামক একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। খুব সম্ভবতঃ এটিই তাঁর উপন্যাস লেখার প্রথম প্রয়াস।

এ পত্রিকায় ১৩০৬ সালের মাঘ সংখ্যায় উপন্যাসটির তৃতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপর এ উপন্যাস সম্পর্কে আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। শিরাজী নিজেও পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। উল্লেখ্য, উপন্যাসটির শেষ কিস্তি প্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সাড়া জাগানো কাব্য 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয়। এমনও হতে পারে যে, এ কাব্যের সমাদর এবং জনপ্রিয়তার কারণে শিরাজী উপন্যাস রচনা থেকে আপাততঃ সরে এসেছিলেন এবং কাব্য রচনায় তাঁর তাবৎ শক্তি ও সাধনা নিয়োজিত করেছিলেন। 'জাহানারা' নামে তিনি আরেকটি উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটিও বেশী দূর এগোয় নি। শিরাজী রচনা সমগ্র থেকে জানা যায়, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জীবনসাধনা এবং সহিত্যকীর্তির প্রকৃত মূল্যায়নে তাঁর 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রায়নন্দিনী সৈয়দ শিরাজীর প্রথম উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের ২২ ফাল্গুন,খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে। এ গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যাৎ পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ সালে। আরো পরে বাংলা ১৩৭৪, ইংরেজী ১৯৬৭ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয়



www.pathagar.com

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'শিরাজী রচানাবলী'র প্রথম খন্ডে শিরাজীর ৪টি উপন্যাস একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে প্রকিাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, শিরাজীর সাহিত্য সাধনার শুরু কবিতা রচনার মাধমে। সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি চার পংক্তির একটি কবিতা রচনা করেন এবং তা সহপাঠীগণসহ স্কুলের শিক্ষকদের প্রভূত প্রশংসা লাভ করে। এরপর বংলা ১৩০৬ সালে তাঁর প্রথম এবং সাড়া জাগানো কাব্যগৃন্থ 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয়। এরপর শিরাজীর সৃষ্টির দুয়ার খুলে যায় এবং বন্যাধারার মত না হলেও অজস্র ধারায় তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, সঙ্গিত, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন।

শিরাজীর গ্রন্থ প্রকাশের কালক্রম অনিুযায়ী দেখা যায়, জীবনের দুই তৃতিয়াংশ সময় (৩৪ বছর, জন্ম ১৮৮০ সাল) পার হয়ে এসে এবং সাহিত্যিক জীবনের মাঝামাঝি সময়ে (১৫ বছরে, ১৯০০ সালে 'অনল প্রবাহ' প্রকাশ এবং ১৯৩১ সালে ইন্তেকাল) এসে 'রায়নন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছে। ধারণা করা যায়, প্রকাশকালের অন্ততঃ ছয় বছর আগে 'রায়নন্দিনী' লেখা হয়।

কারণ লেখা শেষ হওয়া মাত্রই কোন প্রকাশক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে তাৎক্ষণিক তৎপরতায় এগিয়ে আসেননি এবং তাঁর নিজের পক্ষেও এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় সংকুলান ছিল অসম্ভব। শিরাজীর নিজের বক্তব্য থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

"বগুড়ার পশারশীল মোক্তার মুন্সী সোনাউল্লা সাহেবের উৎসাহ এবং খরচ বহনের প্রবল স্বীকৃতিতে আমি বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিদ্বন্দী উপন্যাস 'রায়নন্দিনী' রচনা করি। রচনা শেষে মুন্সী সোনাউল্লাহ সাহেবকে যখন বিস্তারিত পত্র লিখিলাম তখন তিনি নীরব হইলেন। অতঃপর নিজে যাইয়া দেখা করিলাম। কিন্তু হায়! তিনি আর প্রতিশ্রুতি পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন না। অতঃপর দীর্ঘকাল পরে বহু চেষ্টা ও যত্নে বন্ধুবর আমীর হোসন খান সাহেবের আগ্রহে জি-সরওয়ার কোং-কে অতি সামান্য অর্থ প্রাপ্তি স্বীকারে ছাপিতে দেই। এই কোং বহু কষ্টেই প্রায় আড়াই বৎসরে এই পুস্তক বাহির করিতে সমর্থ হয়।"

তবে সাধনা পত্রিকায় ১৩২৮ সালের জৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শিরাজীর 'কারাকাহিনী' শীর্ষক রচনার সূত্রে ডক্টর বদিউজ্জামান জানিয়েছেন, শিরাজী ফরাসী অধিকৃত চন্দন নগরে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় 'রায়নন্দিনী' লিখিত হয়। কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণের আগে তিনি 'আদব কায়দা শিক্ষা' 'মহাশিক্ষা কাব্য'-২য় খন্ড এবং 'রায়নন্দিনী'সহ আরো কিছু ক্ষুদ্র কবিতার পান্ডুলিপি ডাকযোগে সিরাজগঞ্জে তার অকৃত্রিম বন্ধু মুন্সী গোলাম মওলার কাছে পাঠিয়ে দেন।



www.pathagar.com

অন্যদিকে শিরাজীর ভাবশিষ্য শেখ আবদুল গফুর জালালী জানান, শিরাজী আত্মসমর্পণের আগে তার জীবনের স্বপ্ন, বহু সাধনার ধন 'মহাশিক্ষা কাব্য' ডাকযোগে সিরাজগঞ্জে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি 'রায়নন্দিনীর' কথা উল্লেখ করেন নি।

এ প্রসঙ্গে 'অনল প্রবাহ' কাব্য বাজেয়াপ্ত এবং রচয়িতা শিরাজীর কারাদন্ড সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা দরকার। 'অনল প্রবাহ' প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০৭ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন বাংলা সরকার স্বাধীনতার বাণী এবং ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের দায়ে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে। শিরাজীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। তিনি সে সময় উত্তরবঙ্গে প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার বিরাট স্বপ্ন মহাশিক্ষা কাব্যের ১ম খন্ড রচনার কাজ শেষ এবং দ্বিতীয় খন্ড রচনার কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে। এসময় গ্রেফতার হ'লে এই কাব্য রচনা শেষ নাও হতে পারে, এ আশংকায় তিনি আত্মগোপন করে থেকে তাঁর রচনা শেষ করতে মনস্থ করেন এবং সে অনুযায়ী বৃটিশ শাসন এলাকার বাইরে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে গিয়ে বাসা নেন। নানা দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের মধ্যে কাব্য রচনার কাজ শেষ হয়। পরে তিনি কলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেট সুইন হোর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। দীর্ঘকাল বিচার চলার পর ১৯১০ সালে তাঁকে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয় । ১৯১২ সালের মে মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

দেখা যায়, প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসের নাম 'রায়নন্দিনী' ছিল না। 'আল এসলাম' ভাদ্র -১৩২৫ সংখ্যায় মোহাম্মদি বুক এজেন্সির বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, গ্রন্থটির নাম "ঈসা খাঁ ও রায়নন্দিনী" বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"ঈষা খাঁ ও রায়নন্দিনী। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের রত্নবিশেষ। মূল্য ১।০টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির নাম বদলে 'রায়নন্দিনী' রাখা হয়।

ইসমাইল হোসেন শিরাজী যখন ' রায়নন্দিনী' রচনা কারেন (সম্ভবতঃ ১৯০৯ সালে), তখন তিনি মোটামুটি কবি -খ্যাতি পেয়েছেন। এটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি একজন বিশিষ্ট মুসলিম লেখক, নেতা হিসেবে স্বীকৃত, তুরস্ক থেকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত। চিন্তা চেতনায় পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট পরিণত এবং পরিণত তিনি বয়সের দিক থেকেও। ১৯১৫ সালে 'রায়নন্দিনী' প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তো এই বয়সে কবি-খ্যাতি লাভকারী শিরাজী উপন্যাস লিখতে এলেন সখ করে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। সাহিত্য সৃষ্টির বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন তার কাছে মুখ্য, বাস্তব ও বেশী জরুরী হয়ে দেখা দিল। কি সেই প্রয়োজন? শিরাজীর উপন্যাসের পটভূমি জানতে ও তাঁর মানসিকতাকে বুঝতে এ প্রয়োজন'টি জানা দরকার।



www.pathagar.com

## ৩.

বাংলা উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রথমদিকে মুসলমান সমাজের অংশ গ্রহণ নেই বললেই চলে। 'রায়নন্দিনীর' প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত লেখকের উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের প্রায় সবাই হিন্দু। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার 'দুর্গেশ নন্দিনী' (১৮৬৫) কে আধুনিককালের প্রথম ঔপন্যাসিক এবং প্রথম আধুনিক উপন্যাস হিসেবে ধরলে 'রায়নন্দনী'র কাল (১৯১৫) পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস ৫০ বছর পেরিয়ে এসেছে। এই অর্ধ শতকে বঙ্কিমের উপন্যাসসমগ্র, তারও পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী ভিত্তিক উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্রজীবন প্রভাত' 'মহারাষ্ট্র জীবন সন্ধ্যা'সহ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু কালজয়ী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একমাত্র মীর মোশাররফ হোসেন এবং মোহাম্মদ নজিবর রহমান ছাড়া আর কোন মুসলমান লেখক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন নি বলেই দেখা যায়। মীর মোশাররফ হোসেন প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক। তার 'বিষাধ সিন্ধু'র প্রকাশকাল প্রথম পর্ব ১৮৮৫, দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৭ ও তৃতীয় পর্ব ১৮৯০। (উল্লেখ্য, এই সময় কালের মধ্যে বঙ্কিমের ৭টি উপন্যাস বেরিয়ে গেছে। এগুলি হলঃ দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫), কপাল কুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২) আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮২)। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এ সময়ে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি, 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'র মত বিখ্যাত উপন্যাস পাঠকের হাতে এসেছে। তবে দেখা গেল, উপন্যাস রচনায় অংশগ্রহণে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে থাকলেও কি ঐতিহাসিক কি সামাজিক উপন্যাস সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রথম রচনা যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় বয়ে এনেছে।

যাই হোক, এ সময়ে হিন্দু ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ভূদেব ও বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসগুলো মুসলিম সমাজের বিপুল ক্ষোভ ও মনস্তাপের কারণ হয়ে উঠেছিল। লেখা-লেখি, বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় এসব উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিক সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনীর' কৎলু খাঁ চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান বলেনঃ

'দুর্গেশ নন্দিনী'তে কৎলু খাঁর চরিত্র উর্বর কল্পনা সাহায্যে অতি কদর্যরূপে



www.pathagar.com

অঙ্কিত হইয়াছে।.....কৎলু খাঁ যে এতদূর নিষ্ঠুর ও লম্পটচূড়ামণি ছিলেন ইহা আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।.....ইতিহাসে ওসমান কৎলু খাঁর পুত্ররূপে পরিকীর্ত্তিত। সেই সম্পর্ক পরিবর্তন করিয়া বঙ্কিম বাবু কি ভাল করিয়াছেন?.....তিনি মুসলমান সমাজের উপর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন বই আর কিছুই নয়।'

আবদুল মালেক চৌধুরী বলেনঃ

"কতিপয় বঙ্গসাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক মুসলমান রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভাবিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইতে হয়। প্রথমে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুর কথাই ধরা যাক।.....তাঁহার আয়েশা, দলনী বেগম, রোশেনারা, জাহানারা, সর্বোপরি জেবুন্নেছা, মোট কথা তাঁহার অমর লেখনীপ্রসূত উদ্ভট কল্পনা বিজড়িত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই বাঙ্গালার আবহাওয়ার গুণে এমন রূপ ধারণ করিয়াছে যে তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা অতীব দুসাধ্য।"

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বলেনঃ

"বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশদ্রোহীর ন্যায় মীর কাসিমের তথা মুসলমানের চরিত্র নির্মমভাবে বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তারপর বঙ্কিম বাবু মীর কাসিমের সেনাপতি বীর চূড়ামণি তকি খাঁর চত্রির কিরূপ বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিবেন কি পাঠক? যে তকি খাঁর বীর চরিত্র আজিও বাঙ্গালীর নিজ্জীব প্রাণে বীররস সঞ্চারিত করে, যাঁহার মহনীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া বাঙ্গালী আজিও দর্প করিয়া বলিতে পারে যে, বাঙ্গালী একদিন মানুষের মত মানুষ ছিল, বাঙ্গালীর বাহুতে বল ছিল, বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে সাহসী ও বীর বলিয়া পরিচিত ছিল, বঙ্কিম বাবুর হস্তে সেই তকি খাঁর একি লাঞ্ছনা।"

'এসলাম প্রচারক' ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন তার 'সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালীপ্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেনঃ

"আসল কথা মুসলমান বিদ্বেষ বঙ্কিমবাবুর হাড়ে হাড়ে বিজড়িত। .....বঙ্কিম মুসলমানদের প্রতি স্বীয় হৃদয়-বিদ্বেষ কোথাও চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই।.....বাঙ্গালী মুসলমানকে তিনি সুচক্ষে দেখেন নাই, এই জন্য বাঙ্গালী মুসলমানও তাহাকে সুচক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালী মুসলমানকে তিনি শত্রু ভাবিয়াছেন, এই জন্যই বাঙ্গালী মুসলমানও তাঁহাকে স্বার্থপর, দেশদ্রোহী মনে করেন।"



www.pathagar.com

সফিয়া খাতুন বি-এ লিখেছেনঃ

"বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও অনুদারতা ছিল।....বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থেই হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের চিত্রির অতি সুন্দর করিয়াছেন এবং মুসলমান বিশেষতঃ মুসলমান স্ত্রীলোকের চরিত্র এত বিশ্রী করিয়াছেন যে, কোন মুসলমান তাহা স্বীকার করিয়া লইতে চাহিবে না। হিন্দুর কাছে আয়েশার চরিত্র ভাল হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের কাছে তত ভাল হইতে পারে না।"

সমকালীন অন্যান্য সচেতন মুসলমানদের মত হিন্দু লেখকদের উপন্যাস এবং কাব্যে মুসলিমদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ এবং ইতিহাসবিকৃতি শিরাজীকেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় তিনি এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনঃ

"কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম, নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যান শিষ্য হারান, পরান, মধু, যধু, চুনীরাম, পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগাল দিতে এবং তাঁহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিত চিত্রে অংকিত করিতে কিছু মাত্র কসুর করিতেছেন না। দিল্লীর মুসলমান বাদশাগণকে তাঁহাদের মর্ম্মর খচিত শান্তসমাহিত গোর হইতে উঠাইয়া উপন্যাস এবং ঘৃণিত কামকুক্কুররূপে চিত্রিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এবং তাহা নাট্যাকারে কলিকাতা এবং মফস্বলের নানাস্থানে অভিনীত হইয়া অগণ্য হিন্দু দর্শকের 'বাহবা' লাভ করিতেছে।....

তাঁহারা অসূর্যম্পশ্যা বাদশাজাদীগণকে হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, গাঁজাখুরী কল্পনাবলে কাহাকেও বা পার্বত্য মূষিক, নারীহন্তা, নরপিশাচ, শিবাজীর প্রণয়াকাঙ্খিনী, কাহাকেও বা শূকরভোজী রাজপূতের প্রেমাভিলাষিনী, কাহাকেও বা কোন হিন্দু গোলামের চরণে সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতছেন।.....হিন্দু লেখক, হিন্দু বক্তা, হিন্দু কবি, হিন্দু ঔপন্যাসিক মাত্রই যেন যবনের মুন্ডপাত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'যবন' শব্দ লিখিয়াই যেন হিন্দু লেখককে লেখনী ধারণ করিতে হয়, নতুবা হিন্দুর কলম মোটেই চলে না। .....চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, প্রত্যেক হিন্দু লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম বা দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র।"

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

"কবি হেমচন্দ্র তাঁহার 'বীরবাহ' কাব্যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার



www.pathagar.com

'আনন্দ মঠে' এবং রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনীতে' মোছলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার বা নির্মূল করিয়া দিবার যে উদ্বোধন ও উত্তেজনা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্তী সাহিত্যে কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গল্পে, থিয়েটারে শতধারে এমনি ব্যাপক করিয়া, গভীর করিয়া, তুমুল করিয়া হিন্দু সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করান হইয়াছে যে, তাহার আদর্শে, অনুকরণে ও অনুসরণে হিন্দু সাহিত্য মোছলেম হিংসার বাণ ডাকিয়াছে।.....বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথমে মোছলেম হিংসার সূত্রপাত হয়।"

এ প্রসঙ্গে আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমদাদুল হক তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্র নাথের 'দুরাশা' গল্পের ব্যাপারে। তিনি বলেছেনঃ

'দুরাশাতে' বাদশাজাদী বদ্রাওন কুমারী (সম্ভ্রান্ত বলা যায় কি? কি জানি।) নিজ মুখে তাঁহার প্রেমের গল্প বলিতেছেন। তিনি পিতার সেনাপতি বীর ব্রাহ্মণ কেশরলালের প্রতি অনুরক্তা। বাদশাজাদী নাকি স্বধর্মের কথা কখনো শুনেন নাই, স্বধর্ম সঙ্গীত উপাসনাবিধিও জানিতেন না, কেননা বিলাসিতায় মুসলমান সমাজের ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। (মুসলমান রমণী, বিশেষ রাজকুমারী, যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, এ কল্পনা নিতান্তই original বলিতে হইবে। কবির উপযুক্ত বটে।)....রবিবাবু দেখাইয়াছেন, মুসলমান রমণী হিন্দু রক্ত প্রবাহ শিরায় অনুভব করিয়া গর্ব করা সত্ত্বেও হিন্দু স্বামী লাভ করিতে হইলে তাহার বহু সাধনা আবশ্যক; কেননা, তাহার দেহে যেটুকু হিন্দুর রক্ত আছে, মুসলমান সংস্পর্শে সেটুকুর জাতি গিয়াছে। রবিবাবুর এ কল্পনায় মুসলমান সমাজ খুবই সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। বঙ্গের প্রিয় কবির ত এই কীর্তি, সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ।"

সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং নিজেরও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে উপন্যাস লিখতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, এ উপক্রমণিকার রচনাকাল ২০শে ফাল্গুন, ১৩২২। এই উপক্রমণিকা অংশ থেকে শিরাজীমানসের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো–একঃ উপন্যাস–নাটক–নভেল লেখা বা পাঠ তিনি পছন্দ করতেন না। দুইঃ স্বজাতিপ্রেমিক শিরাজী খ্যাতনামা মুসলিম চরিত্রসমূহের উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি এবং তাও আবার হিন্দু লেখকের হাতে সহ্য করতে পারেননি, তিনঃ মুসলমান জাতি এবং তাদের কীর্তিকলাপে তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, চারঃ কাব্য–নাটক–উপন্যাসে মুসলিম ইতিহাস ও চরিত্র সমূহের বিকৃতি মুসলমান সমাজের জন্য ক্ষতি এনেছে–এটা তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন, পাঁচঃ মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর জন্য তিনি ঐসব হিন্দু লেখকদেরকে অভিযুক্ত



www.pathagar.com

করেছেন, ছয় এবং সর্বশেষঃ তিনি তাদের উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনার প্রতিবাদে এবং মুসলমান সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খায় নিজেই বাধ্য হয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়াছেন।

মূলতঃ এই হলো শিরাজীর উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট।

## ৪.

'রায়নন্দিনী' শিরাজীর প্রথম ও প্রধান উপন্যাস। এ উপন্যাসে মোট একুশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। শিরাজীকে উপন্যাসের শুরুতে প্রথম পরিচ্ছেদে সুদীর্ঘ এক বাক্যে, ওজস্বিনী ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে প্রথমেই মুসলমানদের অতীত গৌরব-কীর্তি-মহিমা বর্ণনা করতে দেখিঃ

"যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দুর্গে, শৈল-শৃঙ্গে ইসলামের অর্ধচন্দ্রশোভিনী বিজয়-পতাকা গর্ব-ভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল,-যখন মধ্যাহ্ন মার্তন্ডের প্রখর প্রভায় বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগদিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল,-যখন মুসলমানের লোক-চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়ভেরী, জলদমন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল-যখন মুসলমানদের শক্তি-মহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্যে ভারত-ভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমন্ডিত হইতেছিল-যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ-কাকলীর সঙ্গে, মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয়-মহিমার আনন্দ সংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল-যখন মুসলমানের শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল-

যখন ব্রহ্মতেজঃসন্দীপ্ত দরবেশদিগের সাধনায় ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের নির্মল কৌমুদীরাশি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছিল-যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব-উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জলন্ত চক্ষু, দোর্দন্ডপ্রতাপ, প্রমুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল-যখন উত্তরে শ্যাম-কাননাম্বর তুষারকিরীটি হিমগিরি তাহার গম্ভীর মেঘ-নির্ঘোষে ও চপলা-বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত বিস্তার ভারত-সমুদ্র অনন্ত কলকল্লোলে ও অনন্ত তরঙ্গবাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান পরম্পরায় বিশুদ্ধ-যশোগাথা কীর্তন করিতেছিল-যখন



www.pathagar.com

পৌরাণিক বংশমর্যাদাভিমানী চন্দ্র, সূর্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শক রাজপুত, জাঠগোত্রীয় অসংখ্য জাতি, মহিমান্বিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ বিদলনকারী চরণতলে ভূনত-জানু ও বিনত মস্তক হইতে কুণ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল-যখন নগরীকুলসম্রাজ্ঞী বিপুলবীর্য ও ঐশ্বর্যশালিনী দিল্লীর তখতে অধ্যবসায়ের অবতার প্রথিতযশা আকবরশাহ্ উপবেশন করিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন-যখন বীরপুরুষ দায়ুদ খাঁ, সুজলা-সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য-উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরব-স্পর্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন-সেই সময়ে এক দিন বৈশাখ মাসে কৃষ্ণ দশমীতে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শ্রীপুর ও খিজিরপুরের মধ্যবর্তী এক বাটিতে কতকগুলি রক্ষীসহ একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল।"

'রায়নন্দিনীর' কাহিনী শুরু হয়েছে শেষ বাক্য থেকে। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর তার মাতুলালয় সাদুল্লাপুরে যাত্রা, পথে প্রতাপাদিত্যের লোকদের হামলা, ঈসা খাঁ কর্তৃক উদ্ধার, প্রেম সঞ্চার, মাতুলালয়ে বিবাহের কথা পাকা হওয়ার প্রেক্ষিতে ঈসা খাঁর কাছে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণের কথা জানিয়ে পত্র প্রেরণ, স্বর্ণময়ীকে বিবাহে ঈসা খাঁর সিদ্ধান্ত, এদিকে স্বর্ণময়ী অপহরণের ব্যর্থতার কারণে প্রতাপাদিত্যের নতুন পরিকল্পনা, সেনাপতি মাহতাব খাঁর ধর্ম বিগর্হিত কাজ বলে প্রতাপাদিত্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, মাহতাব খাঁ-অরুণাবতী পর্ব, ঈসা খাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, মাতুলপুত্র কর্তৃক স্বর্ণময়ী অপহরণ। মাহতাব খাঁ কর্তৃক উদ্ধার, স্বর্ণ অপহরণের সাতে জড়িত সন্দেহে প্রতাপাদিত্য বনাম কেদার রায়-ঈসা খাঁ তুমুল যুদ্ধ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়, স্বর্ণকে ফিরে পাওয়ার প্রেক্ষিতে দু'পক্ষে সমঝোতা, দাক্ষিণাত্য থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগ দিতে ঈসা খাঁর প্রতি উদাত্ত আহবান, তালিকোটের যুদ্ধে যোগদান, বিজয় লাভ, শূলাঘাতে ঈসা খাঁর জীবন সংশয়, স্বর্ণময়ীর দাক্ষিণাত্য গমন, নিজ শরীরের মাংস দান, সুস্থ হয়ে ঈসা খাঁ-স্বর্ণময়ী বিবাহ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, পথে অরুণাবতীকে উদ্ধার ও মাহতাব খাঁ-অরুণাবতী মিলন।

মোটামুটিভাবে এই হল, 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী-কাঠামোর উপকরণ। এর সাথে রয়েছে শাহ্ মহীউদ্দীন কাশ্মীরীর নৌকাযোগে বাংলা আগমন, পূণ্য ক্ষমতা বলে এবং আকর্ষণীয় ব্যবহারে লোকের রোগমুক্তি ও ইসলাম প্রচার, শ্রীপুরের হিন্দুকুলগুরু যশোদানন্দের তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনীর মূল পটভূমি ষোড়শ শতকের বাংলাদেশ। প্রাধান চরিত্র বারোভূঁইয়ার প্রধান পুরুষ ঈসা খাঁ ও শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী। মানবতা, উদারতা, মহত্ব, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি মানবীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর



www.pathagar.com

চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে ঈসা খাঁর চরিত্রে। কিন্তু ঈসা খাঁ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে তা হলো ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য তার গভীর অনুরাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এ কারণেই আমরা দেখি, মুসলিমবিদ্বেষী, উগ্র হিন্দু ধর্মবাদী রাজা রামরায়ের বিরুদ্ধে ঘোষিত জেহাদে তিনি আহমদ নগর এবং বিজাপুর রাজ্যের সুলতানদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন আগ্রহের সাথে এবং সাধ্যমত সৈন্য ও সমরোপকরণসহ সে জেহাদে যোগ দিতে যাত্রা করেছেন। যুদ্ধে ঈসা খাঁ অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আমন্ত্রণকারী সুলতানবর্গ কর্তৃক 'গাজী' উপাধিসহ বহুমূল্য খেলাত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। এই জেহাদে যোগদানের জন্য তিনি অবলীলায় তাঁর প্রেমাস্পদা স্বর্ণময়ীকে চিরতরে হারানোর ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন, যা তার স্বজাতিপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছে জাতীয় ধর্মীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ– ভোগ–বিলাসের আহবান বড় হতে পারে না।

অনুরূপ দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায় অন্যতম প্রধান চরিত্র মাহতাব খাঁর মধ্যেও। নিমকহালাল এই সুদক্ষ সেনাপতি ন্যায়ের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহস, বলিষ্ঠতা ও চরিত্র–দৃঢ়তার কারণে মাহতাব খাঁ সে কালের হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত মুসলিম সমাজের জন্য একটি উদাহরণ।

এ উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র শাহ্ সূফী মহিউদ্দীন কাশ্মীরী। আচার–আচরণে, অধ্যাত্মসাধনায় অর্জিত ক্ষমতা বলে তিনি তৎকালীন বাংলা ভূখন্ডে আগত অসংখ্য ইসলাম প্রচারক সূফী–দরবেশের একজন হয়ে উঠেছেন।

নারী চরিত্রের মধ্যে স্বল্প পরিসরে ঈসা খাঁর মাতা আয়েশা বেগম একজন আদর্শ মুসলিম মাতার প্রতীক। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মাতা হয়ে তিনি নির্দ্বিধায় ক্ষমতাশালী পুত্রকে তিরস্কার করেছেন, প্রয়োজনে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুসলিম মাতার চরিত্রের ছবিই আমরা আয়েশা বেগমের মধ্যে দেখতে পাই।

স্বর্ণময়ী চরিত্রটি প্রধান নারী চরিত্র। উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই সে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের জন্য তার দীর্ঘ অভিযাত্রা এবং নিজের বাহু থেকে মাংস কেটে ঈসা খাঁকে প্রদানের মাধ্যমে সে পাঠকের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়।

## ৫.

'রায়নন্দিনী' উপন্যাস পাঠ করে তৎকালীন মুসলিম সমাজের আলোড়ন জেগেছিল। দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। 'রায়নন্দিনী' পাঠ করে সেকালের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক খানবাহাদুর মৌলবী তসলিমউদ্দীন আহমদ শিরাজীকে লিখেছিলেনঃ



www.pathagar.com

"ধন্যবাদ! হাজার ধন্যবাদ!....'রায়নন্দিনী'র প্রথমাংশ পড়িয়াই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বিদ্বেষী গ্রন্থকারদের উচিত জবাব দিয়া সমাজের অসাধারণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য আপনি যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যত বংশধরেরা আপনার জয়গান চিরকাল করিবে।

তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর, সমাজগতপ্রাণ মৌলবী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এম, এ, লিখেছেনঃ ' মোহাম্মদী'তে আপনার 'রায়নন্দিনী'র বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিতেছিলাম। খরিদ করিয়া পড়িলাম। পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীপুরের বর্ণনা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা এত চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী ও এত জীবন্ত হইয়াছে যে, আমি পুনঃ পুনঃ সেগুলি পাঠ করিয়াছি। মাহতাব খাঁতে আত্মসম্মানজ্ঞান, ঈসা খাঁতে স্বজাতি প্রেম ও ইসলামিক গৌরব, শৌর্য্য-বীর্য্য এবং তেজস্বিতা ইত্যাদি সমস্তই অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ....নায়িকাকে যেরূপ হইতে হয়, স্বর্ণময়ী সেইরূপই হইয়াছে। মোট কথা, পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আপনি মুসলমান সমাজের বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া উঠুন। আমার মোবারকবাদ জানিবেন।

মৌলবী মোয়াজ্জেম আলী খাঁ 'রায়নন্দিনী' পাঠ করে লিখলেনঃ

"সেদিন সিরাজগঞ্জে আপনার প্রণীত 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস দেখিয়া পড়িবার লোভ হয়। অপরাহ্নে পাঠ আরম্ভ করিয়া এতই আনন্দ বোধ হয় যে, রাত্রের মধ্যে শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যে পুস্তকখানা অতুলনীয় হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার না হইলে সমাজের উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই।"

এম, সেরাজুল হক লিখেছেনঃ

"'রায়নন্দিনী' তখনি লিখিত হয়, যখন বাংলা সাহিত্য মোসলেম-বিদ্বেষীদের আড্ডায় পরিণত হইয়া জাতীয় কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত হইতেছিল। সেই সময় তিনি তাহার দাঁদভাঙ্গা জবাব দিয়া মাতৃভাষা চর্চায় ও সাহিত্যরাজ্যে এক নবধ্যায়ের সূচনা করেন।"

'আল এসলাম' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছেঃ

"ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের রত্নবিশেষ।"

বরিশালের মৌলবী আব্দুর রহিম চৌধুরী লিখেছিলেনঃ

"নৈরাশ্য-অন্ধকারে মগ্ন মুসলমান সমাজে মহাজীবনের যে বন্যা আপনি বহাইয়াছেন, 'রায়নন্দিনী'র বজ্রমুখ-লেখনী দ্বারা মুসলিম-বিদ্বেষী সাহিত্যিকদের চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে মুসলিম-গৌরবকে রক্ষা করিয়াছেন, সুদূর তুরস্কের মরণ-আহবে যোগদান করিয়া ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য যে ত্যাগ ও সেবার পরিচয় দিয়াছেন, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন



www.pathagar.com

বাগ্মীরূপে সমাজের উত্থানের মহামন্ত্র অবিশ্রান্তরূপে প্রচার করিয়া চলিয়াছেন, তদুপরি ব্যক্তিগত জীবনকে আপনি যেরূপ জ্ঞান, চরিত্র, ধর্ম, সত্য ও ন্যায়ের মণিকাঞ্চনে বিভূষিত করিয়া আদর্শ জীবনে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সম্মানের যোগ্য বন্দোবস্ত করিবার মত সুবুদ্ধি আমাদের হইবে কিনা খোদা জানেন।"

## ৬.

'রায়নন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্রকে অবলম্বন করে যে উপন্যাস রচিত হয়, তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে উপন্যাস ইতিহাস নয়। ইতিহাসের সত্য রক্ষা করলে উপন্যাস হয় না, উপন্যাস হতে গেলে ইতিহাসের সব সত্য রক্ষা করা যায় না। বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতাদের কেউই তা করেন নি। শিরাজীও না। কাহিনী ও ঘটনার কিছু অংশ ঐতিহাসিক সত্য, বাকী অংশ কল্পনার ফসল। এ দুই মিলিয়েই 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস রচিত হয়েছে। এ উপন্যাস কেন লেখা–সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সমকালীন আর দশটি উপন্যাসের মত এটিও ঘটনাবহুল, নাটকীয়তাপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য; প্রচলিত আঙ্গিকে ও পদ্ধতির অনুসরণে রচিত, অথচ সাধারণ উপন্যাস নয়।। সাধারণ উপন্যাস নয় এ কারণে যে, 'রায়নন্দিনী' একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা এবং তা লেখকের সবিশেষ যত্নপরিপুষ্ট। এটি অবসর বিনোদনের উপকরণ বা ঘুম আসার আগে ব্যবহৃত নিদ্রা–টনিক মার্কা মিষ্টি প্রেমসর্বস্ব উপন্যাস নয়। শিরাজী সাহিত্য–খ্যাতিপিপাসু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত শিল্পের দেবতাকে আরাধ্য করে উপন্যাস রচনার জন্য কলম ধরেননি, মুসলিম কলঙ্ক ও জাতীয় অবমাননার ফলে সৃষ্ট আগ্রেয়গিরির প্রায় বিস্ফোরণোন্মুখ চূড়ায় বসে তিনি কলম চালিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সুস্পষ্ট এই মানসিকতার লেখকের কাছে পূর্বঘোষণা সত্ত্বেও আমরা একটি চমৎকার উপন্যাসই পাই, উপন্যাস নামে 'অ–উপন্যাস' নয়।

শিরাজীর সামনে উপন্যাস রচনার কাজটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জ হিন্দু ঔপন্যাসিকদের একদেশদর্শিতা মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। শিরাজীর আগে আমরা দেখেছি, মীর মোশাররফ হোসেনকে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করতে। কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু' কারবালার নির্মম ঘটনা প্রবাহকে করুণ রসে আপ্লুত করে বাঙ্গালী মুসলমানের চোখে যত পানি ঝরিয়েছে, জাতীয় অধঃপতনের গভীর গহবর থেকে উন্নতির আলোকিত পৃথিবীর অভিযাত্রী হতে জাতিকে তা কোন অনুপ্রেরণা যোগায়নি। মূলত মীর মোশাররফ হোসেন–এর মধ্যে শিরাজীর মত জাতীয় চিন্তা বা স্বাজাত্যবোধ না থাকার কারণেই তা হয়েছে। তাই, 'বিষাদ সিন্ধু'র কুড়ি বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–এর 'দুর্গেশ নন্দিনী' এবং পরে অন্যান্য উপন্যাস



www.pathagar.com

প্রকাশিত হলেও সেগুলোর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বধর্মপ্রীতি, হিন্দু জাত্যাভিমান এবং মুসলিম অবমাননার মত বিষয়গুলো মীর মোশাররফ হোসেন-এর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। হয়তো বা তিনি এ বিষয়টি লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু মুসলিম বাংলা কথাসাহিত্যের জনক মীর মোশাররফ হোসেন তখন যে কাজটি করেন নি, ৫০ বছর পর হলেও শিরাজী তা করলেন। নিখাদ জাতীয় চেতনার ভিত্তিভূমিতে নিজেকে স্থাপন করে শিরাজী ফিরে গেলেন ৩শ' বছর আগের ইতিহাসে মুসলিম শৌর্য-বীর্য এবং বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটির চিহ্ন মাখা ঈসা খাঁকে নিয়ে এলেন সমকালে; আনন্দের মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করলেন তৃষ্ণার্ত, ব্যথিত মুসলিম সমাজকে।

মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ এ উপন্যাসকে সাদরে বরণ করেছিল। জানা যায়, সেকালের মুসলিম বাংলায় ৩টি উপন্যাস অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একঃ মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু', দুইঃ মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' এবং তিনঃ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'রায়নন্দিনী'। তাঁর অন্য ৩টি উপন্যাস একই উদ্দেশ্যে লেখা হলেও 'রায়নন্দিনী'র মত জনপ্রিয়তা পায়নি।

'রায়নন্দিনী' প্রকাশের পর মুসলমান লেখক-লেখিকাদের হাত থেকে কিছু ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস বেরিয়ে এসেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনী' (১৯১৭), শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর' (১৯১৯), মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরীর 'কালাপাহাড়' (১৯২০), শেখ আবদুল গফুরের 'সোলতানা রাজিয়া' (১৯২০), শাহাদাৎ হোসেনের 'মরুর কুসুম' (১৯২১), 'সোনার কাঁকন' (১৯২৩), মোবারক আলীর 'সোফিয়া' (১৯২২), নূরুন্নেছা খাতুনের 'জানকী বাঈ' (১৯২৪), প্রভৃতি। এছাড়া কিছু সামাজিক উপন্যাসও রচিত হয়। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কাজী ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ' (১৯৩৩), ও মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' (১৯৩৫)। (জোহরা' ১৯১৭ সালে রচনা সমাপ্তি হলেও বহু বিলম্বে প্রকাশের মুখ দেখে।)

যাহোক, শিরাজী-পরবর্তী এবং তাঁর জীবদ্দশায় (মৃ. ১৯১৩) রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর সাথে শিরাজীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। শিরাজীর উপন্যাসে আমরা মুসলিম জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্খার যে রূপায়ণ লক্ষ্য করি, এ সকল উপন্যাসে তার কিছুই ঘটেনি। মুসলিম- গৌরব, বীরত্ব, কীর্তি-গাথা, প্রেম প্রভৃতির দেখা এসব উপন্যাসে পাওয়া গেলেও স্বাধীনতা, স্বাজাত্যবোধ, কলঙ্ক-অপবাদ স্খলন বা প্রতিবাদী চেতনায় এই লেখকদের কাউকেই উদ্দীপিত দেখা যায় না। মনে হয়, উপন্যাসের প্রতি দুর্বলতাজনিত কারণেই সীমাবদ্ধ শক্তি সত্ত্বেও তাঁরা উপন্যাস লেখায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। সমকালীন হিন্দু জাগরণ, মুসলমান সমাজের দুর্দশা, পুনর্জাগরণের প্রয়াস, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তারা ব্যক্তি



www.pathagar.com

জীবনে হয়ত অনুভব করেছেন, তবে উপন্যাস-মাধ্যমে এসবের উপস্থাপন ঘটাতে চাননি।

তাই লক্ষ্য করা যায়, মুসলিম স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের উদ্দেশ্যমূলক অবমাননায় বিক্ষুব্ধ, স্বজাতিপ্রেমিক শিরাজী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে হাতে কলম তুলে নিলেন, তাঁর সে পথে সত্যকার অর্থে আর কেউ সহযাত্রী হননি। তার মত মনের জোর, জাতির প্রতি সুগভীর দরদ, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আরো বহু লেখকেরই হয়ত ছিল, কিন্তু তারা কেউই হিন্দু ঔপন্যাসিকদের আক্রমণের, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রতিবাদে নিজেদের কলমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেননি। বরং তারা যেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই দেখা গেল, ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলমানদের টেনে আনা হল, সামাজিক উপন্যাসে সমাজের সামাজিক সমস্যার উপরও দৃষ্টি পড়ল, কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও জাতীয় মর্যাদার নিশানবরদার হিসেবে কাউকেই দেখা গেল না। এ কারণে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে শিরাজী প্রথম প্রতিবাদী ঔপন্যাসিক।

কোন সন্দেহ নেই, 'উপন্যাসের ঘোর বিরোধী' শিরাজী হিন্দু ঔপন্যাসিকদের একতরফা মুসলিম-আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসেবেই 'রায়নন্দিনী' রচনা করেছিলেন। বিদ্বেষের প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও এ উপন্যাসের কোথাও তার মানসের সংকীর্ণতা বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের পরিচয় লক্ষিত হয় না। ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার পাখায় ভর করে, অসত্যের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সুখ্যাত, শ্রদ্ধাভাজন মুসলিম চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। শিরাজী সে তুলনায় অনেক বেশি উদার মন এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন, ঐতিহাসিক সত্যকে অবিকৃত রাখার। লক্ষণীয় যে, হিন্দুদের প্রতি ব্যক্তিগত কোন ঘৃণা, জাতীয় ও ধর্মীয় বিদ্বেষের ছায়াপাত তাঁর উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে শিরাজীর মহৎ সাহিত্যসত্তারই পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ মহৎ সত্তা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং মুসলিম সমাজ তথা গোটা জাতির জন্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

## ৭.

'রায়নন্দিনী'তে উপন্যাস-কাঠামোর মধ্যে শিরাজীর কয়েকটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। তিনি চেয়েছিলেন, এ উপন্যাসে ১. মুসলিম অতীত গৌরবের কথা শোনাবেন, ২. মুসলিম বীরপুরুষদের উজ্জ্বল মহিমাময় চরিত্র-চিত্র এঁকে দেখাবেন, ৩. সেকালের হিন্দু নারীরা যে বীর মুসলিম পুরুষদের প্রণয়ধন্য হতেন, তার রূপায়ণ করবেন, ৪. হিন্দুদের বর্ণিত বীর চরিত্রগুলোর প্রকৃতি কলঙ্কময় দিকটি উন্মোচন করবেন, ৫. মুসলিম দরবেশরা তাদের পূতস্নিগ্ধ চরিত্র-মাহাত্ম্যে কিভাবে এদেশের



www.pathagar.com

মানুষের মন জয় ও ইসলাম প্রচার করেন তা দেখাবেন, ৬. মুসলিম বীরপুরুষদের বাহুবল, সাহস, দুঃসাহসিক বীরত্ব ও দুর্জয় মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরবেন, ৭. প্রয়োজনের তাগিদে সুদূরপ্রান্ত হতেও এক মুসলমান আরেক মুসলমানের আহবানে কিভাবে সাগ্রহে সাড়া দেয় তা দেখাবেন। উল্লেখ্য, এই প্রতিটি বিষয়ের রূপায়ণই তৎকালীন মুসলিম সমাজ দেখতে চাইছিল। শিরাজী অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করলেন। এর ফলে 'রায়নন্দিনী' শিল্পসফল উপন্যাস হয়ত হল না, কিন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্খার রূপদান করে তা জাতীয় উপন্যাস হয়ে উঠল। বাংলার মুসলিম সমাজ দেখল, অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতা থেকে পাঠান বীর ঈসা খাঁ মুসলিম শৌর্য-বীর্য, উদারতা, মহত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধের মূর্ত প্রতীক হয়ে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন; হিন্দু রাজকন্যা স্বর্ণময়ী তার প্রেমে আকুল হয়ে অবশেষে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছেন; হিন্দু কুলগৌরব রাজা প্রতাপাদিত্যের মহিমা-আরোপিত তথাকথিত বীর চরিত্র আসলে দুঃশ্চরিত্রতা এবং শঠতার প্রতিমূর্তি; মুসলমান বীরগণ 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহ আকবর' ধ্বনির জোশে প্রাণভয় তুচ্ছ করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং জয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছেন। শিরাজীর উপন্যাসে এ বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করে মুসলিম সমাজ অনুপ্রাণিত হল, হিন্দু লেখকদের মুসলিম চরিত্র কলঙ্ক আরোপের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের জ্বালা অনেকখানি প্রশমিত হল।

'রায়নন্দিনী' তাই শুধু প্রতিবাদী উপন্যাসই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম অতীত গৌরব, সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল আয়নাও বটে। সে কালের পরাধীন, হিন্দুদের অবহেলা-উপক্ষোর শিকার পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমান সমাজ এ আয়নায় নিজেদের হারানো দিনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল এবং নিজেদের দুর্দশার প্রতিবিধানে তৎপর হয়েছিল। 'রায়নন্দিনী'র সার্থকতা এখানেই।

-হোসেন মাহমুদ



www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com